ডেল্টা প্লান -২১০০

বঙ্গীয় ব-দ্বীপ পরিস্থিতি: পটভূমি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল

অনিল বিশ্বাস
ইকবাল কবির জাহিদ

সহজপাঠ প্রকাশন

ডেল্টা প্লান - ২১০০
বঙ্গীয় ব-দ্বীপ পরিস্থিতি: পটভূমি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল

Delta Plan – 2100
Bengal Delta Consequences: South-Western Context

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ৪, ১৪২৫
জানুয়ারী ১৭, ২০১৯

দ্বিতীয় প্রকাশ
চৈত্র **২৪, ১৪২৫**
এপ্রিল ৭, ২০১৯

সম্পাদনা
ড. দীপক কুমার বিশ্বাস

প্রকাশক
প্রফেসর ইসারুল হক
সহজপাঠ প্রকাশন
নীলরতন ধন রোড
যশোর

মুদ্রণে
আধুনিক ছাপাঘর
পি টি আই রোড
যশোর

মূল্য: ৩০ টাকা

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনপদ ও জনজীবন এক কঠিন পরিবেশ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আর এ বিপর্যয়ের প্রথম বহি:প্রকাশ ঘটে বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের কঠিন লবণাক্ততার মধ্য দিয়ে। যার প্রভাবে ঘটেছিল উপর্যুপরি ফসলহানি। সে সময় হাজার হাজার মানুষ অভাবের তাড়নায় খেতে না পেয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছিলেন। প্রতিকারের উপায় হিসাবে সে সময় সরকার বিদেশি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে নদীপাড় ও তৎসংলগ্ন সমতল ভূমি অর্থাৎ ফসলের মাঠের চারিধারে বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। এলাকাকে তখন কতকগুলি পোল্ডারে (polder) বিভক্ত করা হয়েছিল যার নাম কর্ডন পদ্ধতি (cordon system)। এতে সাময়িকভাবে নোনা পানির হানা থেকে ফসল বাঁচানো গেলেও দ্বিতীয় বার দেখা দেয় জলাবদ্ধতা। আসলে এই জলাবদ্ধতা পোল্ডার ব্যবস্থারই ফল। বিল ডাকাতিয়া, ভবদহ এলাকা এবং কপোতাক্ষ অববাহিকার বিস্তীর্ণ জনপদ বছরের পর বছর বদ্ধ পানির নিচে তলিয়ে থেকেছে। এ থেকে মুক্তি পেতে যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় জোরালো গণ আন্দোলন সংগঠিত হয়ে চলেছে। এসব ঘটনার সাথে যুক্ত থেকে আমরা জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণ অনুসন্ধান করেছি। এই কাজের মধ্য দিয়েই আমাদের এই ধারণা হয়েছে, নদনদীর স্বাভাবিক প্রবাহে হস্তক্ষেপ করা হলে তা লাভের চেয়ে ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্তা ও জলাবদ্ধতার জন্য দায়ী এখানকার নদী ও পানির স্বাভাবিক প্রবাহের ওপর হস্তক্ষেপ। মূলতঃ ব্রিটিশ শাসনামলেই এ অঞ্চলের নদী ব্যবস্থার ওপর হস্তক্ষেপের সূত্রপাত হয়েছিল। পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে নীতিগত ভাবে নদী প্রবাহকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সেই একই নীতি আঁকড়ে ধরে নদীসমূহকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের পথে অগ্রসর হচ্ছে। আসলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে বন্যা প্রতিরোধের পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। এটা ভালোর চেয়ে দেশের জন্য উত্তরোত্তর ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছে। সে কারণে চলমান এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অভিজ্ঞতায় আলোকে বন্যা প্রতিরোধের নীতিকে আমরা বাস্তবতা বিবর্জিত দারুন একটা ভুল বলে বিবেচনা করছি। তাই অতীতের ভুলের মাসুল না বাড়িয়ে স্বাভাবিক বন্যাকে মেনে নেওয়া

দেশের জন্য বরং মঙ্গল। এ পুস্তকে আমরা সে কথাটি বলার চেষ্টা করেছি।

বিগত শতকের ষাটের দশকে কর্ডন পদ্ধতি বাস্তবায়ন কালে পূর্বসৃষ্ট নদী সমস্যার সংশোধন করা হয়নি। প্রকৃতির নিয়ম না মেনে তার বিকৃতি ঘটানো প্রকৃতি মেনে নেয় না। কর্ডন বাস্তবায়ন কালে প্রকৃতির নিয়ম মানা হয়নি। যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে অতীতে কর্ডন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল, ডেল্টা প্লান ২১০০ প্রণয়নে সে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায় নি। 'বঙ্গীয় বদ্বীপ পরিস্থিতি: পটভূমি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল' লেখাটি ডেল্টা প্লান ২১০০-কে কেন্দ্র করে। এখানে চূড়ান্ত ভাবে আমাদের অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের সেই অভিজ্ঞতা কতখানি বস্তুনিষ্ঠ ছিল তা যাচাই করার প্রয়োজনে বিশিষ্ট গবেষকদের মতামত ও নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। যে সব বিষয় এই লেখায় দেখানো হয়েছে তার শিরোনামগুলি নিচে দেওয়া হলো :

সূচনা, ২. ব-দ্বীপ গঠনের পর্ব বিভাগ, ৩. বঙ্গীয় ব-দ্বীপের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ৪. ভবিষ্য প্রবণতা ৫. অতীত বন্যার পর্যালোচনা, ৬. বন্যা প্রতিরোধের পদক্ষেপ ও ফলাফল, ৭. বিদেশ-সংশ্লিষ্টতা, ৮. ক্রুগমিশন ৯. আইইসিও ১০. এনডব্লিউপি, ১১. ফ্যাপ, ১২. রোজার্স রিপোর্ট, ১৩. ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণে তৎপরতা, ১৪. ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষয়-ক্ষতির চিত্র, ১৫. জলবায়ুপ্রসঙ্গ কথা, ১৬. আইপিসিসি প্রশ্নবিদ্ধ, ১৭. গমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ১৮. অবনমন, ১৯. অতলস্পর্শের প্রভাব, ২০. ভূমিকম্প ঝড় জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব, ২১. নদী প্রবাহে হস্তক্ষেপ, ২২. নেদারল্যান্ডের অভিজ্ঞতা, ২৩. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলাবদ্ধতা প্রশ্নে ডেল্টা ২১০০, ২৪. পরিকল্পিত জোয়ারাধার, ২৫. টিআরএম অভিজ্ঞতা, ২৬. ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র, ২৭. ভেড়ি বাঁধ বুদ্ধিমানের কাজ নয়, ২৮. ডাকাতিয়া থেকে জেঠুয়া, ২৯. কর্ডনে ক্ষয় ক্ষতি, ৩০. মুক্ত প্লাবনের সুবিধা, ৩১. বিশেষ করণীয়, ৩২. আশু করণীয়, ৩৩. উপসংহার

নদীমাতৃক দেশে নদী না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না। নদীর পায়ে বেড়ি পরিয়ে নদীশাসনের সকল প্রচেষ্টা বার বার বিপর্যয় ডেকে আনছে। এর থেকে নিষ্কৃতির পথ কী তা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। নদী প্রকৃতির কাছ থেকে কিভাবে সহযোগিতা পাওয়া যায় তার উপায় খুঁজে পেতে বিজ্ঞানের সব প্রচেষ্টা কাজে লাগাতে হবে।

সূচনা

বন্যা, জলাবদ্ধতা, নদীভাঙন, লবণাক্ততা, ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি সকল ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কর্ডন ব্যবস্থার শুরু থেকে এই ষাট বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত অনেক বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। পুনর্বাসনের নামে আজ অবদি একই রকম কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্প পুনর্বাসনে আমেরিকা, বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও নেদারল্যান্ডের পরামর্শ ও সহযোগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। তাদের সহযোগী হিসাবে দেশি-বিদেশি পরামর্শদাতা ও বাছা বাছা এনজিওদের এ সব কাজের সাথে যুক্ত করা হয়ে থাকে।

ইদানিং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন নামক একটি নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। সারা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে সামনের কাতারে তুলে ধরা হয়েছে। যে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশের জনজীবন বারবার বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে তার জন্য মুখ্যত জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করা হচ্ছে। ইতোপূর্বে বন্যা প্রতিরোধকল্পে যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায়ও সেই একই ধরনের কর্মসূচি পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর কোনটাই দেশকে বন্যা, নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততার সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারে নি। বরং আগের তুলনায় বন্যার পৌনপৌণিকতা ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে ক্রুগমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী সারা দেশে বন্যা প্রতিরোধ এবং উপকূলীয় অঞ্চলকে নোনা পানির হানা থেকে চিরতরে মুক্ত রাখার দাবিতে পোল্ডার ও উপকূলীয় বাঁধের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু সেই কর্মসূচি সফল হয় নি। পূর্বেই বলা হয়েছে প্রথম দিকে বছর দশেক বাঁধের সুবাদে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নোনা পানির হানা থেকে ফসল বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তী কালে সেখানে নতুন উপসর্গ আকারে দেখা দিয়েছে 'জলাবদ্ধতা'। ফলাফল দেখেই বোঝা যায়, এ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকেরা ভুল পথে চালিত হয়েছেন। তাই, নয়া ভিশন ডেল্টা প্লান ২১০০-

এর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চলমান জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার সংকট সমাধানে প্রস্তাবিত নয়া পানি নীতি কতটুকু কার্যকর তা দেখার উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। ক্রুগ প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন কালে প্রথমেই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে বিশেষ করে সুন্দরবন সংলগ্ন যশোর জেলার দক্ষিণাংশ ও খুলনা জেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এ অঞ্চল তখন ভয়াবহ লবণাক্ততার সংকটে নিমজ্জিত। দেশের অন্যত্র বন্যার বিষয়টি গুরুতর সমস্যাকারে দেখা হতো। তবে যশোরের দক্ষিণাংশ ও সাতক্ষীরা সহ সুন্দরবন সংলগ্ন খুলনা জেলা ততখানি বন্যাক্রান্ত ছিল না। এ অঞ্চলের সমস্যা ছিল পানি ও জমিতে প্রকট লবণাক্ততা। বিদ্যমান বাস্তবতার নিরীখে ক্রুগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য মঙ্গলদায়ক হয় নি। ফলাফল বিচারেই তা বোঝা যায়। কর্ডন দিয়ে সাময়িক কয়েক বছর লোনা পানির আগ্রাসন ঠেকানো গেলেও ক্রুগ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরবর্তী ফলই যে জলাবদ্ধতা সে কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এখন এ অঞ্চলের চলমান জলাবদ্ধ পরিবেশ এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি সরকার নেদারল্যান্ডের অভিজ্ঞতা, পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে নয়া পানিনীতি ঘোষণা করেছে। এই নয়া পানিনীতির নাম দেওয়া হয়েছে *বাংলাদেশ ডেল্টা ওয়াটার ২১০০*। সংক্ষেপে *ডেল্টা প্লান ২১০০*। ইতোমধ্যে নতুন এই পানি নীতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এ জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি হিসাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে বেছে নেওয়া হয়েছে। নতুন এই পানি নীতি বাস্তবায়নের শুরু হয়েছে ভবদহ অঞ্চলে বিল কপালিয়ার টিআরএম প্রকল্প বাতিল করার মধ্য দিয়ে। সামগ্রিক ভাবে এই নয়া পানি নীতি এলাকার জন্য কতটুকু ফলদায়ক হবে তা যাচাই করা একান্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। নয়া পানি নীতি বাস্তবায়নের ফলাফল যাচাইয়ের জন্য তাই বঙ্গীয় ব-দ্বীপ সংক্রান্তে ভূ-বিজ্ঞানিদের মতামত, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেখা আমাদের উদ্দেশ্য।

ব-দ্বীপ গঠনের পর্ব বিভাগ

নদী হলো সুদীর্ঘ প্রাকৃতিক পানিপ্রবাহ। নদীর জন্ম উচ্চ পার্বত্য ভূমিতে। সাগরে তার পতন। উচ্চ ভূমিতে বৃষ্টিপাত অথবা বরফগলা পানি ঝর্ণার আকারে বিভিন্ন ধারায় খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে প্রবল বেগে নিচের দিকে

নেমে আসতে থাকে। ঝর্ণাগুলির মিলনেই নদীর জন্ম । সমতল ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদী সাধারণত সাগরে মিলিত হয়। উৎস থেকে সাগর পর্যন্ত নদীর গতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। পাহাড়ি অঞ্চলে নদীর গতিকে বলা হয় উচ্চ গতি বা প্রাথমিক গতি। প্রাথমিক গতিতে নদীর ভরবেগ প্রচণ্ড থাকে। তার ভাঙ্গনের ক্ষমতাও থাকে প্রবল। বিরাট বিরাট পাথরের খণ্ড, নুড়ি, ঝিল, কাকর সমূহ প্রবল স্রোতের ধাক্কায় ধাক্কায় নিচে বহদূর পর্যন্ত গড়িয়ে আসতে থাকে। পাহাড়-ধসা মাটি, অববাহিকার ধোয়ানি, বালি, বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক মিশ্রিত পলিরেণু কর্দমাকারে নদীর স্রোতে ভেসে আসে। সমতল ভূমিতে নদীর গতি মন্থর হয়ে আসে। এখানে ভাঙ্গন এবং গঠন দুইই চলতে থাকে। সমতল ভূমিতে তাই নদী চলে এঁকে বেঁকে। সমতল ভূমিতে নদীর গতিকে বলে মধ্য গতি। সাগর মোহনায় কাছাকাছি নদীর যে গতি তাকে বলে নদীর নিম্নগতি। এখানে নদীর গতি আরও মন্থর হয়ে পড়ে। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা তার অন্যতম কারণ। মোহনা অঞ্চলে নদীর ক্ষয়ের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে পড়ে। এখানে নদী কেবল গঠন করতেই পারে। নদী তার চলার গতিতে ওপর থেকে যতো পলি বয়ে আনে তাই জমে জমে মোহনায় দ্বীপ জেগে উঠে। ঐ দ্বীপের মুখে নদীর স্রোতধারা বিভক্ত হয়ে এর দু'পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। সে কারণে নতুন গড়ে উঠা দ্বীপটিকে খানিকটা মাত্রাবিহীন বাংলা 'ব'-এর মতো দেখায়। এ জন্য মোহনায় গড়ে ওঠা দ্বীপটিকে বলা হয় ব-দ্বীপ।

ব-দ্বীপ পূর্ণতা পেতে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে। বাংলাদেশ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অংশ। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এখন ব-দ্বীপ গঠনের কোন বিশেষ পর্যায়ে আছে তা বিবেচনায় থাকলে এখানে পরিবেশসংক্রন্ত কোনও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুবিধা হয়। তার জন্য শুরুতে ব-দ্বীপ গঠনের বিভিন্ন পর্ব নিয়ে সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করা গেল।

ব-দ্বীপভূমি পূর্ণতা পেতে এর গঠন প্রক্রিয়ায় চারটি পর্ব অতিক্রম করে। প্রথমে নদীবাহিত পলি দ্বারা সমুদ্রের তলদেশে ধীরে ধীরে একটি পলিমঞ্চ সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে পলিমঞ্চটি পানির নীচে ডুবন্ত অবস্থায় থাকে। ১৯৬৮ সালের ভূমিকম্পের পর সমুদ্র পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, হিমালয়ের পলিতে বঙ্গোপসাগরে গঠিত ১২ কিলোমিটারের চেয়ে পুরু পলিমঞ্চটি প্রস্থে প্রায় ১,০০০ কিলোমিটার এবং দৈর্ঘ্যে ৩,০০০ কিলোমিটার। পলিমঞ্চটি শ্রীলঙ্কার দিকে ক্রমাগ্রসর হচ্ছে। এই পলিমঞ্চের বিশাল আয়তনই বঙ্গীয় ব-দ্বীপ গঠন প্রক্রিয়ার বিশালত্ব ও শক্তির প্রমাণ দেয়।

সমুদ্রে পানির নীচে গড়ে ওঠা পলিমঞ্চে প্রতিবছর স্তরে স্তরে পলি জমতে থাকে। এক সময় তা পানির ওপর জেগে ওঠে। জোয়ারের সময় দেখা না গেলেও ভাটার সময় দেখা যায়। এটা দ্বীপ গঠনের দ্বিতীয় পর্ব। তৃতীয় পর্বে উপনীত হলে দ্বীপাংশটি স্থায়ী ভাবে জেগে ওঠে। গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে দ্বীপাংশ চতুর্থ স্তরে পৌঁছায়। তখন এটাকে বলা হয় মুমূর্ষু দ্বীপাংশ। জলতলে নিমজ্জিত অবস্থাটি পলিমঞ্চ। পলিমঞ্চ ও দ্বিতীয় পর্বের দ্বীপাংশটি ব-দ্বীপের কর্মঠ অংশ এবং তৃতীয় স্তরটি পরিণত দ্বীপাংশ।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের কর্মঠ অংশে আজও সমুদ্র থেকে নতুন জমি উদ্ধারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া চলছে। এ অংশের ভূমি ক্রমশঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠছে।

বিশিষ্ট নদীবিজ্ঞানী কপিল ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার নদনদী ও পরিকল্পনা' নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চল, অবিভক্ত খুলনা

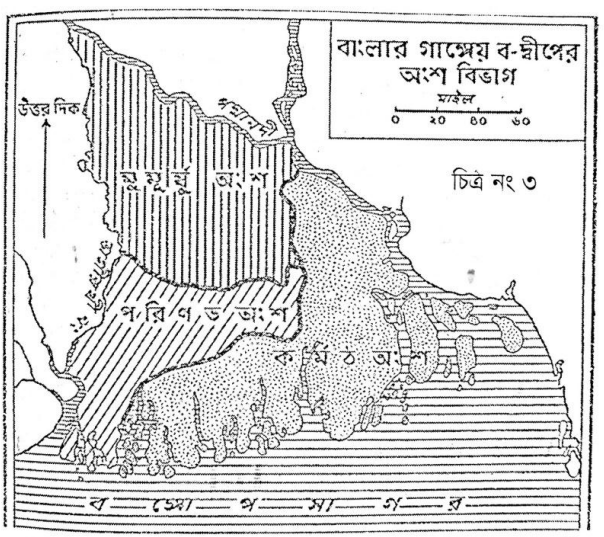

চিত্র ১: ব-দ্বীপ গঠনের স্তরবিন্যাস (বাংলার নদনদী ও পরিকল্পনা : কপিল ভট্টাচার্য)।

জেলার দক্ষিণাংশ, সমগ্র বরিশাল, নোয়াখালি ও ফরিদপুর জেলা ব-দ্বীপের কর্মঠ অংশের অন্তর্গত। এ ছাড়া চব্বিশ পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চল ছাড়া বাকী অংশ, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার উত্তরাংশ এবং যশোরের দক্ষিণাংশ, নড়াইল ব-দ্বীপের পরিণত অংশ। ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ের

মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা পর্যন্ত নবগঙ্গা নদীর পশ্চিমাংশ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের মুমূর্ষু অংশের অন্তর্গত।

বঙ্গীয় ব-দ্বীপের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ বাদে বাংলাদেশের বাকি অংশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও স্বাধীন বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত যে ভূভাগ তার প্রায় পুরোটাই একটি ব-দ্বীপ যা গাঙ্গেয় বা বঙ্গীয় ব-দ্বীপ নামে পরিচিত। পৃথিবীর অপরাপর সকল ব-দ্বীপ থেকে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের কিছু অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এক, অধিকাংশ ব-দ্বীপ কোনও একটিমাত্র দেশের ক্ষুদ্রতম অংশ কিন্তু বাংলাদেশের পূর্বাংশে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের কিছু অংশ বাদে বাকী সবটুকুই ব-দ্বীপ।

দুই, আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব-দ্বীপ যে বিশেষ নদীর দ্বারা গঠিত তার অববাহিকা একই দেশের অন্তর্গত। যেমন মিসিসিপির সমগ্র অববাহিকা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত; ইয়াংসি, হো ও পীত নদী যে সব ব-দ্বীপ গঠন করেছে, সেগুলি চীনের ভূ-খন্ড। সম্পূর্ণ আমাজন দ্বীপ ও আমাজান অববাহিকার বেশির ভাগ অংশ ব্রাজিলীয় ভূ-খণ্ডের অন্তর্গত। একমাত্র বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যে সকল নদী বইছে, তাদের অববাহিকা বাংলাদেশ সহ ভুটান, চীন, ভারত ও নেপাল এই পাঁচটি দেশের ওপর দিয়ে বিস্তৃত। আবার এই মোট অববাহিকার মাত্র শতকরা ৮ ভাগ নিয়েই বাংলাদেশ।

তিন, ঋতুভেদে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের কারণে এ অঞ্চলের নদনদীতে প্রতি বছর পানিপ্রবাহের প্রচণ্ড হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানি প্রবাহ কমে যায়। বর্ষায় নদীগুলি ফুলে ফেঁপে ওঠে। এই ঘটনা বাংলাদেশের নদীসমূহের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ সকল নদী অববাহিকায় বছরের মাত্র ৪ মাসে ৮৫% ভাগ বৃষ্টিপাত সংঘঠিত হয়। বাকী ৯ মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ১৫% ভাগ। তাই অন্যান্য দেশের ব-দ্বীপের তুলনায় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে নদীর পাড় উপচিয়ে সমতল ভূমি পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনা অনেক বেশি।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। শুধু তাইই নয়, এই ব-দ্বীপটি যুক্তভাবে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মতো পৃথিবীর তিনটি মহাশক্তিধর নদীবাহিত পলি দ্বারা গড়ে উঠেছে। এই তিন মহানদী এবং তাদের শাখা-

প্রশাখা ও উপনদীসহ মোট ৮১৩টি নদী জালের মতো বিস্তার লাভ করে প্রবাহিত হচ্ছে মাত্র ১ লক্ষ ৫৬ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের ঘন জনবহুল ক্ষুদ্র দেশটির ওপর দিয়ে। চরিত্র বিচারে তাই গাঙ্গেয়ব-দ্বীপ বহুমাত্রিক।

প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম তাঁর *Alternative Approaches to Flood Control : The Case of Bangladesh* নামক লেখায় এ সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক চিত্র দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার যুক্ত অববাহিকার মোট আয়তন ১৭ লক্ষ ৫৮ হাজার বর্গ কিলোমিটার যা বাংলাদেশের আয়তনের ১২ গুণ বড়।

১. গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর অববাহিকায় বছরে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় এবং বাংলাদেশের নদীখাত দিয়ে যে পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়ে তার পরিমাণ মিসিসিপি অববাহিকায় বৃষ্টিপাতের ৪ গুণ; যদিও মিসিসিপি অববাহিকার আয়তন বাংলাদেশের দ্বিগুণ।

২. হিমালয় পর্বত অঞ্চলে উৎপন্ন নদীসমূহ যতো পরিমাণ পলি বাংলাদেশে বয়ে আনে তার পরিমাণ ২ বিলিয়ন টনেরও বেশি। পৃথিবীর সকল নদী মিলে মোট যে পরিমাণ পলি বহন করে তার ৪ ভাগের ৩ ভাগই আসে বাংলাদেশের নদীতে।

৩. প্রতিবছর জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই চার মাসে গড়ে প্রায় ৭৭৫ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি বাইরে থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এবং এই সময় কালে দেশের অভ্যন্তরের বৃষ্টিপাতের দরুন আরও প্রায় ১৮৪ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি তার সাথে যুক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নদীতে মাত্র ১২ বিলিয়ন ঘনমিটার মতো পানি প্রবাহিত হয়।

৪. এ ছাড়া লক্ষণীয় গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর মোট দৈর্ঘ্য মিসিসিপির ৩ গুণ।

ওপরের সংখ্যাগুলো প্রমাণ করে কী বিশাল এক জলবাহী কর্মকাণ্ড গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে ক্রিয়াশীল। ভূ-প্রকৃতির বিচারে বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অংশ। এখানে নদীসম্পর্ক থেকে প্লাবন ভূমিকে বিচ্ছিন্ন করার যে কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প মাতৃনাড়ি থেকে গর্ভস্থ শিশুকে

বিচ্ছিন্ন করার সামিল। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের মৌলিক চরিত্রকে উপেক্ষা করে এখানে কোনও ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল কাজে আসবে না। কোনও প্রকার মঙ্গলদায়ক ফলাফল দিতে না পারলেও তা কেবল বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। তাই, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এখানকার ভূ-প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সর্বপ্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের দাবি রাখে।

ভবিষ্যপ্রবণতা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততাসহ যে সকল পরিবেশ বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটছে তা মোকাবেলার স্বার্থে নিম্নোক্ত কিছু ভবিষ্যপ্রবণতা হিসাবে রাখা একান্ত জরুরি।

১. সে সব প্রবণতার মধ্যে একটি ভরা মৌসুমে পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি। এটা সত্যি যে, দেশের বাইরে উজানের দেশে, বিশেষ করে, ভারতে নদীর ওপর অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঐ প্রকল্পগুলোর কারণে বিপুল পরিমাণ পানি নদী থেকে তোলা হচ্ছে। এ সব ক্ষেত্রে ভাটির দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করা হচ্ছে। ভারতের ঐ প্রকলপগুলোর কারণে বাংলাদেশের নদীতে শুষ্ক মৌসুমে পানির সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। তা ছাড়া শুকা মৌসুমে প্রবাহ কমে যাওয়ায় নদনদীর বুক পলি ভরাট হয়ে উঁচু হয়ে উঠছে। অন্য দিকে বর্ষা কালে কারও পক্ষে পানি আটকে রাখার কোনও উপায় নেই। বর্ষাকালে বাংলাদেশের নদীতে স্বাভাবিক কারণে পানির চাপ বেড়ে যায়। অতিরিক্ত পানি বহন করার ক্ষমতাই থাকে না। এই অবস্থায় নতুন উপসর্গ হয়ে দেখা দিয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। যার ফলে ভারত মহাসাগরে বাষ্পীভবণ বৃদ্ধি ও হিমালয়ের হিমবাহে গলনের মাত্রা বাড়তে পারে।

২. ভেড়ি বাঁধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ গেট ও কর্ডন-ব্যবস্থার কারণে স্বাভাবিক পানি প্রবাহের এলাকা সঙ্কুচিত হওয়ায় বন্যার উচ্চতা বাড়বে।

৩. এছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সমুদ্র-সমতলের উচ্চতা বাড়াচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

৪. ভবিষ্যতে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নদীতে পলির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এর অন্যতম কারণ পার্বত্য অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃক্ষ নিধনের ফলে হিমালয়ের পার্বত্য ভূমি আগের তুলনায় উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে।

এতে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমুদ্র-সমতলের উচ্চতা বৃদ্ধি, বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি, অতিরিক্ত বরফ গলা, নদীতে বেশি বেশি পলি নামা এক সাথে এত সব প্রাকৃতিক শক্তির মহাসমারোহ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি জন্ম দিতে পারে। সমুদ্র-সমতলের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে নদীর পানি দ্রুত সমুদ্রে নির্গমনে বাধা পাবে। তাই বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের যে কোনও কার্যক্রম সফল করতে এই প্রবণতাগুলো হিসাবে রাখতে হবে।

অতীত বন্যার পর্যালোচনা

অতীতের গবেষণামূলক প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, বিগত তিন শত বছরে এদেশে বড় ধরনের বন্যার ঘটনা ঘটেছে ১৭৮৭, ১৮৮৭, ১৯৪৩, ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ সালে। ১৯৫৩ সালের পর এ পর্যন্ত সংরক্ষিত তথ্য থেকে জানা যায়, বন্যার পানির গভীরতা, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার আয়তন, ফসল ও অবকাঠামোগত ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা এবং ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ উপর্যুপরি বেড়েই চলেছে। ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, বন্যার পৌনপৌনিকতা, ব্যাপকতা ও স্থায়িত্ব কাল গত ৫ দশকে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে বেড়েই চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৭৪-এর বন্যায় বাংলাদেশের মোট আয়তনের (১,৪৪,০০০ বর্গ কি.মি) ৩৫% ভাগ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৮ সাল এই ২৫ বছরের মধ্যে বিশাল আয়তনের ৪টি বন্যা (১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮ ও ১৯৯৮) হয়েছে। গড়ে ৬ বছরে একটি করে বন্যা।

অপর একটি গবেষণা সূত্রে আরও জানা যায়, ১৯৮০ ও ১৯৮৪ সালে আরও দু'টি বন্যা হয়। ঐ দু'টি বন্যায় দেশের ৩০% ভাগ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই হিসাবে ১৯৭৪ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ২৭ বছরে ৭টি বন্যার ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ গড়ে প্রতি ৪ বছর অন্তর ১টি করে বড় বন্যা। এছাড়া দেখা যায়, ১৯৭৪ থেকে (কেবল ১৯৮৪ সাল বাদে) বড় বড় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের আয়তনও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ১৯৭৪ সালে দেশের ৩৫% ভাগ এলাকা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার তুলনায় ১৯৯৮ সালে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৬৮% ভাগ এলাকা। বিভিন্ন গবেষকদের হিসাবে এই বৃদ্ধির ভাগ সামান্য হেরফের হলেও বন্যাকবলিত এলাকার আয়তন বাড়ার প্রবণতা মহাশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছর যাবত দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করে চলেছে। অতীতের সকল রেকর্ড ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

বন্যা প্রতিরোধের পদক্ষেপ ও ফলাফল

বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য বন্যা প্রতিরোধে পর্যবসিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ধরা পড়ছে একটি দারুণ দৃষ্টিভঙ্গিগত অসঙ্গতি। বন্যা প্রতিরোধের পদক্ষেপ বলতে কর্তৃপক্ষ কেবল নদীর তীর বরাবর সমান্তরাল বাঁধ (ভেড়ি বাঁধ), পোল্ডার, স্লুইস গেট এসবই বোঝেন। পানি উন্নয়ন সূত্র থেকে জানা যায়, ১৯৫৪ সালে ক্রুগ মিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়িত করতে গিয়ে ওয়াপদা ১৯৬৭ সালের মধ্যে সারাদেশে ৪,০০০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ, ৭৮২টি স্লুইচ গেট ও ৯২টি পোল্ডার নির্মাণ করে। একমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নির্মাণ করা

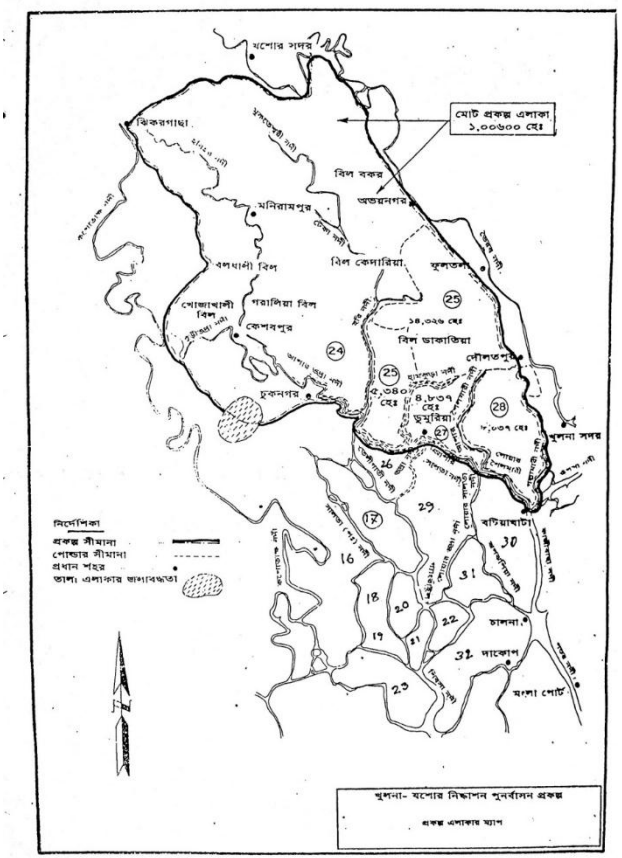

চিত্র ২:পোল্ডার (খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প : আশরাফু-উল-আলম টুটু)।

হয় ১,৫৬৬ কিলোমিটার বাঁধ, ৩৭টি পোল্ডার ও ২৮২টি বন্যা নিয়ন্ত্রক বাঁধ।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) সূত্রে আরও জানা যায়, ২০০৫ সাল পর্যন্ত ৩,৪৩৩ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধ সহ মোট ভেডি বাঁধের দৈর্ঘ্য বেড়ে ৫,৬৯৫ কিলোমিটারে ঠেকেছে। ২০১২ সালের হিসাব অনুযায়ী এই সব বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য হয়েছে ১০,২২৪ কিলোমিটার। আর ১৪,১২৬টি স্লুইচ গেট বানানো হয়েছে। বলা হচ্ছে ১১,৫০০ টি নিষ্কাশন খাল খনন করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি খালের মুখেই তো স্লুইচ গেট বসানো হয়েছে। আবার প্রায় সর্বত্র গেটের মুখে পলি জমে ওগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে। নদীতীর বরাবর প্রায় ৫৬১ কিলোমিটার সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ৭২১টি বন্যা নিরসন ও নিষ্কাশন/সেচ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বলা হচ্ছে এই প্রকল্পগুলি দ্বারা ৫৮.৯১ লক্ষ হেক্টর জমি উপকৃত হবে।

অভিজ্ঞতা বলছে, বাঁধ নির্মাণ করতে না করতেই একাধিক জায়গায় তা আবার ধসে যাচ্ছে। এ ধরনের বাঁধের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয় আসলে বন্যা প্রতিরোধে পর্যবসিত হয়েছে যা ব-দ্বীপ পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পর্যালোচনার দবি রাখে, পানি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে ১৯৬০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত কত টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে, তাতে আদৌ কি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিমাণ কমেছে না বেড়েছে, টাকার অংকে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণই বা কত। লাভ লোকসানের বিচারে লোকসানের অংকই যদি বড় হয় তাহলে এ সব প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়ে নেতিবাচক সমালোচনা এড়ানো সম্ভব নয়।

বিদেশ সংশ্লিষ্টতা

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে। ওয়াপদা ভেঙ্গে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে। কিন্তু পানি নীতি প্রণয়নে ক্রুগ মিশনের সুপারিশের বাইরে যাওয়া যায়নি; অর্থাৎ নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়া যাইনি। এ বেলায় বিদেশি প্রভাব বলয়ের জাল ছিন্ন করে স্বাধীন দেশে কোনও সরকারের পক্ষে স্বাধীন পানি নীতি গ্রহণ সম্ভব হয় নি।

ক্রুগ মিশন

বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে আমাদের দেশে প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয় ১৯৫৪ সালের পর থেকে। ১৯৫০-এর বন্যায় ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের অনুরোধে জাতি সংঘের মাধ্যমে এদেশে ক্রুগ মিশনের আগমন ঘটে। তারা বন্যা প্রতিরোধের লক্ষ্যে নদীর তীর বরাবর সমান্তরাল বাঁধ নির্মাণের সুপারিশ করেন। ১৯৫৯ সালে গঠিত হয় ওয়াপদা। মিশন প্রধান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আর্মি ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সদস্য জেনারেল ক্রুগের নামানুসারে মিশনটি ক্রুগ মিশন নামে পরিচিতি পায়। মিশনের অন্যান্য সদস্যও ছিলেন একই আর্মিকোরের। তাদের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬০-৭০ এর মধ্যে এদেশে পানি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ডিএনডি প্রকল্প, ব্রক্ষ্মপুত্রের ডান তীর বরাবর কর্ডন প্রকল্প, গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) প্রজেক্ট, ভবদহ গেট, উপকূলীয় বাঁধ প্রভৃতি প্রকল্প এই সময় বাস্তবায়িত হয়।

শুরুতে বাংলাদেশে পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যতগুলি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে তার সবকটিতে অর্থায়ন ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় রয়েছে একটি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দাতা সংস্থা বা যাদেরকে উন্নয়ন সহযোগী নামে অবিহিত করা হয়, তারা এই সব প্রকল্পের মাধ্যমেই বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

আইইসিও

১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিসকো শহরের 'ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি' (আইইসিও) কর্তৃক প্রণীত 'মাস্টার প্লান' বাংলাদেশের পানি উন্নয়নধারা নির্ধারণ করে দেয়। জানা যায়, এটাই ছিল নদ-নদী সমূহের প্রতি 'অবরোধ পন্থা'র মাস্টার প্লান। ইংরাজিতে বলা হয় 'কর্ডন অ্যাপ্রোচ' ভিত্তিক পানি উন্নয়ন প্রচেষ্টা। ক্রুগ মিশন প্রস্তাবের পরিপূর্ণ রূপ। একটি বড় এলাকাকে কয়েকটি কম্পার্টমেন্টে ভাগ করে তার প্রতিটির চতুর্দিকে কর্ডন অর্থাৎ বাঁধ নির্মাণ করা হয়। বাঁধ ঘেরা অংশটিকে বলা হয় পোল্ডর। তাই পোল্ডার হলো নদীর প্রতি 'অবরোধ পন্থা'। বিশ্ব ব্যাংকের পর্যালোচনা অনুযায়ী পোল্ডারগুলো যতখানি এলাকায় বিস্তৃত হয় তা বাংলাদেশের কৃষি জমির প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। তাদের হিসাব অনুযায়ী সারা দেশে প্রায় ৮০ লক্ষ একর জমি পোল্ডারে পরিণত করার পরিকল্পনা। এই পর্যালোচনায় আরও লক্ষ্য করা যায় যে মাস্টার প্লান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে পোল্ডার এবং কোথাও বা পুরো জেলাটিকে পোল্ডারে পরিণত করার কর্মসূচি গৃহীত হয়।

প্লাবন ভূমির কোনও অংশকে পোল্ডারে পরিণত করা হলে বাকি অংশের ওপর বন্যার সময় পানির চাপ বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে আপাতত বন্যার পানি প্রবেশ করতে পারবে না এই ভরসায় পোল্ডারের ভেতর দ্রুত গতিতে বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এখন ভেবে দেখা যেতে পারে কোনও কারণে বাঁধ ভেঙ্গে গেলে পোল্ডারের মানুষজন কি কঠিন প্লাবনের সম্মুখীন হবেন! এ ছাড়া পোল্ডারের ভেতর একটি সাংবাৎসরিক জলাবদ্ধতার দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যমান পরিস্থিতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এনডব্লিউপি

যেহেতু বিদেশি সাহায্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে এদেশে বিদেশি কারিগরি সহযোগিতা আসে, সেহেতু একের পর এক পানি ব্যবস্থা প্রণয়নে বিদেশনির্ভরতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহায্যের নামে মোটা অংকের অর্থের প্রলোভনও এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একশ্রেণির আমলা, এমনকি রাজনীতিবিদদেরও আকর্ষণ করে। একই সাথে গড়ে উঠে স্বার্থান্বেষী চক্র। তাই, পরবর্তী পানি নীতি প্রণয়নেও বিদেশনির্ভরতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। ক্রুগ মিশনের পর আসে *National Water Plan (NWP)*। একে বলা হয় বাংলাদেশে পানি নীতির নীলনক্শা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এটি তৈরি করেছিল আমেরিকার শিকাগোভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হাজা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারন্যাশনাল।

ফ্যাপ

তৎকালীন সিডিপির পরিচালক আশরাফ-উল-আলম টুটুর লেখা *উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প জলাবদ্ধতার সূচনা-১৯৯৭* প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, বিশ্ব ব্যাংক ও তার দক্ষিণ এশিয় সহযোগী প্রতিষ্ঠান এডিবি বাংলাদেশে ১৯৮৮ সালের বন্যার পর *Various Flood Action Plan (FAP)* প্রণয়ন করে উপকূলীয় অঞ্চলসহ সারাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে বন্যা প্রতিরোধের নামে দ্বিতীয় উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প *Coastal Embankment Rehabilitation Project-CERP-2* গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের সম্প্রসারণে খুলনা-যশোর নিষ্কাশন প্রকল্প *KJDRP-1, KJDRP-2, 3, 4* ইত্যাকার একের পর এক ব্যয়বহুল মহা পরিকল্পনা *(mega project)* এ অঞ্চলের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া

হয়েছে। এ প্রকল্প সমূহ হাস্কনিং প্রকল্প নামে পরিচিত। এ সব প্রকল্পের কয়েকটিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে যুক্ত করা হয়। হাস্কনিং প্রকল্পের সংশোধিত প্রাক্কলিক ব্যয় ছিল ২৩৮ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, *FAP-4*-এর ব্যয় ২৮৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা, *KJDRP-1*-এর ২১৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা, *KJDRP-2*-এর ২৩৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ২৭৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।

এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে সীমাহীন দুর্নীতি হয়েছে। এর সব ক'টি প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু কেন ব্যর্থ হয়েছিল আজ পর্যন্ত তার কোনও পর্যালোচনার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় নি। আবার ব্যর্থতার দায়ভার বিদেশি প্রকল্প প্রণেতাগণ নিজেদের ঘাড়ে নিতে চান নি। অথচ একের পর এক বিপর্যয় সৃষ্টিকারি প্রকল্প জনগণকে গেলানোর জন্য এদেশের সরকার, একশ্রেণির আমলা, পোষমানা বিশেষজ্ঞ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পানি উন্নয়ন বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার, বশংবদ কন্সালট্যান্ট্ এবং বাছাবাছা এনজিওদের ওপর সওয়ার হয়েছেন তারা। আবার প্রকল্পগুলির পক্ষে জনগণের সমর্থন আছে বলে প্রচারে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা তাদের নিজস্ব ফরমুলায় গঠিত মাল্টিস্টেইকহোল্ডার ফোরামে পছন্দমাফিক লোক জোগাড় করে বিভিন্ন স্তরে সেমিনার, কনভেনশন, মতবিনিময় সভা করে চলেছেন। হাজির করে চলেছেন, একের পর এক ধারণাপত্র। মূল প্রবক্তারা নিজেদের প্রচ্ছন্ন রাখার জন্য নেদারল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের ব্যবহার করছেন। যদিও তাদের একটি অংশ পানি-ব্যবস্থাপনায় অধ্যয়নরত গবেষণাস্তরের ছাত্র মাত্র। তারাও স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিতি পাচ্ছেন।

ফ্যাপ এদেশে নতুন কিছু নয়। পুনর্বাসনের নামে ক্রুগ মিশনের প্রস্তাবনারই একটি নয়া সংস্করণ মাত্র। তাদের অতীত প্রচারণায় কেবল বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও লবণাক্ততা রোধের কথা থাকতো। এখন তার সাথে যুক্ত করা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কথা। রহস্যজনক হলো, বিশ্ব ব্যাংক বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হ্রাস করার জন্য রিওডি জেনেরিও ঘোষণা, কিয়োটো কনভেনশনের ঘোষণা এবং কোপেনহেগেন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য কখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রাজি করানোর কোনও উদ্যোগ নেয় না। অথচ তারাই এখন বড় ব্যস্ত ঘুর পথে ফ্যাপের প্রকল্পগুলোকে এ দেশে জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট সংকট নিরসনে করণীয় বলে প্রচারে ।

ফ্যাপ-এর মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়নের পর বাংলাদেশের নদী, বিশেষ করে, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নদী ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গেছে। তাদের

কর্মকাণ্ডের জের হিসাবে হারিয়ে গেছে এ অঞ্চলের হামকুড়োর মতো বড় বড় নদী। এখন কেবলই প্রচারে সামনে আসছে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলেই দেশের ৩৭ ভাগ অঞ্চল সমুদ্রে ডুবে যাবে। কেউ যদি সন্দেহবশত বলে, এই ধরনের প্রচারের আসল উদ্দেশ্য ওদের দায় এড়ানোর কৌশল মাত্র। তাতে কি ভুল হবে? আইলা, সিডরে বাঁধ ভাঙ্গছে! দায়ী কে? জলবায়ু পরিবর্তন! বন্যার পানিতে জনপদ ডুবছে! এর জন্য দায়ী কে? জলবায়ু পরিবর্তন! সিলেটে হাওড় অঞ্চলে বন্যার জন্য দায় কার? সে ক্ষেত্রেও দায়ী জলবায়ু পরিবর্তন! উত্তর বাংলায় বন্যার জন্য দায়ী কে? জলবায়ু পরিবর্তন। অতীতের সকল সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে ১৯৫৪ থেকে এ পর্যন্ত বন্যা প্রতিরোধের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশের ওপর একের পর এক ক্ষতিকর কর্মসূচি চাপিয়ে দিয়েছেন। এতে আমাদের নদীগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সে বেলায় সব চুপ। এখন যে যার দায় এড়াতে কেবলই তারস্বরে জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করে চলেছেন। একই উদ্দেশ্যে কি রোজার্স কমিশনের রিপোর্টটি হিমঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় নি? উত্তর মিলবে না!

রোজার্স রিপোর্ট

অকার্যকর বন্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির জন্য, তাই বলে, সব বিদেশি পরামর্শকে দায়ী করা সঙ্গত নয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বলেছেন, রোজার্স কমিশন একটি ব্যক্তিক্রম। যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন ওয়াটার স্টাডি (*Eastern Waters Study-EWS)*। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ পর পর দুই বছর বাংলাদেশে বিধ্বংসী বন্যার ঘটনা ঘটে। এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির পরামর্শে *USAID* মিশন এই কমিশন গঠন করেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন হার্ভার্ট ইউনিভার্সিটির এনভাইরনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডেপার্টমেন্টের প্রফেসর ড. পিটার রোজার্স। আরও উল্লেখ্য, এটা ছিল *Irrigation Support Project for Asia and the Near East Supported by US Agency for International Development*। ব্যাপক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ও সতর্কতার সাথে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর ড. রোজার্স তাঁর রিপোর্টে কর্ডন পদ্ধতির বিরোধিতা করে উন্মুক্ত প্লাবন পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দুঃখজনক হলো, তৎকালীন সামরিক সরকার রোজার্স রিপোর্ট উপেক্ষা করে এবং তড়িঘড়ি করে বিশ্ব ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে সে বছরই গঠিত হয় বন্যা

নিয়ন্ত্রণে বহুমুখী মহা প্রকল্প Various Flood Action Program সংক্ষেপে ফ্যাপ (FAP)। ফ্যাপের পরামর্শ মেনে বাংলাদেশের মহা শক্তিশালী নদী সমূহের তীর বরাবর শত শত কিলোমিটার সমান্তরাল বাঁধ নির্মাণ কাজের গতি বাড়িয়ে দেয়া হয়। আমাদের ব-দ্বীপভূমিকে কতকগুলো বদ্ধ কম্পার্টমেন্টে ভাগ করে মাল্টিমিলিয়ন প্রজেক্ট বাস্তবায়নের পথ বেছে নেয়া হয়। একই সাথে EWS-র রিপোর্টটি হিমঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ইউএসএইড-র তত্ত্বাবধানে এবং তাদেরই অর্থায়নে রোজার্স কমিশনের রিপোর্টটি প্রণীত হয়েছিল। রহস্যজনক হলো ইউএস গভর্নমেন্ট অতঃপর এর দায় এড়িয়ে গেছে। হয়তো সে কারণে রিপোর্টটির শুরুতে সতর্কতার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, *Opinion expressed herein are those of the Contractor and do not necessarily the official views of the United States Government*। অর্থাৎ এই রিপোর্টে যে মতামত প্রকাশিত হয়েছে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি (*official)* মতামত নয়। বরং যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এটা তাদের নিজস্ব মতামত। এতেই বোঝা যায়, রিপোর্টটি হাতে পাওয়ার পর মার্কিন কর্তৃপক্ষ মহলে কী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। যারা এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, মতলব বলব না, তাদের কোন একটা নিশ্চিত লক্ষ্য পূর্বনির্ধারিত ছিল! তার সাথে মেলেনি বলেই রোজার্স কমিশনের রিপোর্টের এই পরিণতি! নির্ধারিত ফলাফল পেতেই হবে এমন আশা করে তো গবেষণা হয় না। অনুমান করতে বাধে না নির্ধারিত লক্ষ্যের সাথে মেলে নি বলে রিপোর্টটি যতই সমৃদ্ধ হোক, তাদের কাছে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য হয় নি। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সহ সারা দেশে নদী ও পানি ব্যবস্থা সংক্রান্ত এ পর্যন্ত যতগুলো প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে তার সবগুলো পাশাপাশি রেখে এক সাথে মিলিয়ে দেখলে বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় এর প্রতিটি প্রকল্প ক্রুগ কমিশনের প্রস্তাবনারই একেকটি নতুনতর সংস্করণ। ফ্যাপ-এর প্রণীত প্রকল্পগুলি পর্যন্ত পুনর্বাসন (rehabilitation) তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এখন কায়দাটা ভিন্ন! অতীতের নীতি পুনর্বাসনের তত্ত্ব প্রকাশ্যে স্বীকার করা হয় না। তবে কার্যক্রম একই থাকছে।

প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম লিখেছেন, ১৯৮৮-তে *FAP*-র বাঁধপ্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যকারিতা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে সমালোচনার ঝড় বইয়ে গেছে। ঐ সময় ঢাকায় বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ তথা ইস্টার্ন বাইপাস বহুমুখী সড়ক-প্রকল্পে পাক্কলিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৪,৭৫৮.২১ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে *FAP* বড় ধরনের পরিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে এ নিয়ে দেশে বিদেশে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। ঐ সময় ইউরোপীয়

পার্লামেন্টেও *FAP*-এর সমালোচনা করা হয়। বাংলাদেশে বিদেশনির্ভর বড় অংকের প্রকল্পগুলো দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য তৈরি হয় অথবা এ সবের অন্তরালে অর্থ লোপাটের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে কি না তা একটু বিশদভাবে ভেবে দেখার তাগিদে এখানে আলোচনাটা তুলে রাখা হলো। অথবা ভেবে দেখা দরকার এ সবের পেছনে দেশকে চিরতরে পরনির্ভরশীল করে রাখার জন্য অন্য কোন মহলের কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না।

ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণে তৎপরতা

১৯৮৯ সালে রোজার্স রিপোর্ট বাতিল হতে না হতেই দেখা গেল যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদীর ওপর ব্রিজ কালভার্ট বানানোর তৎপরতা। কপোতাক্ষ, বেতনা, হামকুড়া, চিত্রা, নবগঙ্গা, ভৈরব প্রভৃতি নদীতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নামে একের পর এক ব্রিজ নির্মাণের হিড়িক পড়ে গেলো। সর্বত্রই দেখা যায়, ব্রিজগুলি খুবই নিম্নমানের। প্রথমত এগুলি নিয়মমাফিক উঁচু করে নির্মিত হয়নি। এগুলি এতই নিচু যে বর্ষাকালে এর নিচে দিয়ে জেলেনৌকাও চলতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ নির্মাণকালে নদী ও খালের স্বাভাবিক পানি প্রবাহের আয়তন কমানো হয়েছে। কপোতাক্ষ নদের ওপর কয়েকটি ব্রিজ নির্মাণ কালে মাটি ভরাট করে আড়াআড়ি বাঁধদেয়া হয়েছিল খরচ বাঁচিয়ে পিলার বসানোর সুবিধার্থে। কার্য শেষে বাঁধের মাটি আর সরানো হয়নি। নদীর মধ্যে আজ অবদি সে সব বাঁধ তেমনই পড়ে আছে। এ সময় কালে গ্রামের ভেতর দিয়ে উন্নয়নের নামে অনেক আঁকা বাঁকা রাস্তা নির্মিত হয়েছে। সে সব রাস্তায় সর্বত্র পানি নিষ্কাশনের উপযোগী পথ রাখা হয়নি। তাই এগুলি পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। গ্রামের মানুষ এগুলোকে কেয়ারের রাস্তা বলে জানে। কপোতাক্ষ নদের ওপর এমন আরও ব্রিজ নির্মাণের খবর আছে যা সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসক, পানিউন্নয়ন বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার, এমনকি সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা পর্যন্ত জানতেন না। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে ব্রিজগুলি নির্মিত হয়েছে ইউএসএইড-এর সহযোগিতায়। এ সময় এলাকায় ইউএসএইড-এর তৎকালীন কান্ট্রি ডিরেক্টরের তৎপর দেখা গেছে। ডাকাতিয়া বিলের পানি নিষ্কাশনের পথ হামকুড়া নদী। ডুমুরিয়ায় হামকুড়া নদীতে ২৫০ ফুট দীর্ঘ একটি ব্রিজ নির্মাণ করা হয় ১৯৯১ সালে। অনেকগুলি বন্যা নিরোধক কপাট বসানো হয় নদীর সাথে যুক্ত খালের মুখে মুখে। নদীটি এখন অস্তিত্বহীন।

কপাটগুলি ফাঁকা মাঠের মধ্যে পড়ে আছে। যশোরে বহুশ্রুত উলসীর খাল খননের সময় বিল মাঁদারের চারিধারে অনেকগুলি বন্যা প্রতিরোধক কপাট বানানো হয়েছিল। সেগুলি তখন কেন করা হয়েছিল এখন আর তার কোনও মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব অপচয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ক্রমবর্ধমান ক্ষয় ক্ষতির চিত্র

বন্যা প্রতিরোধকল্পে শত শত কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা সত্ত্বেও বন্যায় দেশে অর্থনীতি, ফসল ও অবকাঠামোগত ক্ষতি একনাগাড়ে বেড়েই চলেছে। একটি পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ১৯৭৪-এর বন্যায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল ৬০০ মিলিয়ন ডলার এবং ১৯৮৮ সালের ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১২০০ মিলিয়ন ডলারে। ১৯৫৩ সালের বন্যায় ০.৬ মিলিয়ন টন ফসল বিনষ্ট হয়েছিল, ১৯৮৮ সালে তার পরিমাণ ৩.২ মিলিয়ন টন। ১৯৯২-এর এক গবেষণায় জানা যায়, ১৯৫৪-র বন্যায় অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১,৫০০ মিলিয়ন টাকা। তা বেড়ে ১৯৮৮এ দাঁড়ায় ৪,০০০ মিলিয়নে। সর্বোচ্চ ক্ষতি হয়েছে ১৯৭৪-এ ২০,০০০ মিলিয়ন টাকা। এ গবেষণায় ধরা পড়ছে, বন্যার কারণে দেশে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৯৫৪ সালে ১,৫০০ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ১৯৮৮-তে দাঁড়ায় ১ লক্ষ মিলিয়ন টাকায়। এগুলি তো আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ। আছে জীবনহানির বিষয়। আরও জানা যায়, ১৯৫৪-র বন্যায় ১১২ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং ১৯৮৮ সালে এসে মৃত্যুর সংখ্যা ২,৩৭৯। যদিও সংখ্যাটা কিছু কমবেশি হতে পারে। তবুও এটা স্পষ্ট যে, বন্যা প্রতিরোধ-বাঁধ কিছুতেই দেশে বন্যা প্রবণতা কমাতে পারেনি। কয়েক দশকের পর্যবেক্ষণে জানা যায়, আগের তুলনায় পর্যায়ক্রমে বন্যার স্থিতিকাল বাড়ছে। আবার প্লাবণতলের উচ্চতাও বাড়ছে। ১৯৮৮ সালের বন্যা ৭০ দিনের বেশি সময় স্থায়ী হয়; কিন্তু ১৯৯৯ সালে বন্যা পুরো মরশুমব্যাপি স্থায়ী হয়। Flood Control in Bangladesh through Best Management Practices শিরোনামে এ সব কথা লিখেছেন প্রফেসার ড. খালেকুজ্জামান।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা এলাকাভেদে স্থায়ী হয়েছে কয়েক মাস থেকে কয়েক বছরব্যাপি; এমনকি কয়েক দশকব্যাপি। আরও শঙ্কার বিষয়, এলাকা ধীরে ধীরে স্থায়ী জলাবদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয়ে উঠছে এবং তা ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। লবণাক্ত এলাকা সেই হারে

আরও দক্ষিণে সরে যাচ্ছে। কপোতাক্ষ নদের খাত যত দক্ষিণে ভরাট হচ্ছে, অববাহিকার জলাবদ্ধতা তত দক্ষিণে সুন্দরবনের দিকে বিস্তার লাভ করছে।

> বন্যা, লবণাক্ততা, নদীভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতা প্রতিরোধের নামে যেসকল প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে সেগুলি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিস্থিতির সাথে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জলবায়ু প্রসঙ্গ কথা

দেখা যাচ্ছে ইদানিং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশ্নে বাংলাদেশের পরিস্থিতিটি বিশ্বসমাজে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে চলেছে। বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ইউএসএইড, কেয়ার, অ্যাক্শনএইড-এর মতো দাতাসংস্থা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট উন্নয়ন-সহযোগী এনজিওরা নানাবিধ মতবিনিময় সভা সেমিনারে উত্থাপিত ধারণাপ্রত্র ও প্রকাশনায় বাংলাদেশের বিপন্ন জনগোষ্ঠিকে অনেক অনেক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে থাকে। এসব সেমিনারপত্রে শিল্পোন্নত দেশ যারা বায়ুমণ্ডলে সিংহভাগ ক্ষতিকর গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করছে, তাদের কাছে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ক্ষতিকারক গ্যাস-নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়ে আনার পরামর্শ থাকে। তাতে থাকে ক্ষতিপুরণের দাবি, ও আত্মরক্ষার পরামর্শ। সেখানে আরও ৩টি বিষয় উচ্চারিত হয়: এক, অভিযোজন (adaptation), দুই, প্রশমন (mitigation)ও তিন, স্থানান্তরণ (migration)-র কথা। সেই সাথে গুরুত্ব দেওয়া হয় সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর। তার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষকে প্রশিক্ষণ বিষয়ে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর দুর্যোগ-প্রতিরোধে জনগণের যদি নিজস্ব কোনও সুযোগ থাকে তা হলে সেখানে সহায়তা বাড়ানোর কথা বলা হয়। কৃষিভিত্তিক জীবন-জীবিকা বাঁচাতে বিকল্প-কৃষি, ক্ষরা ও লবণসহিষ্ণু উন্নত প্রজাতির ধান উদ্ভাবনে ব্যাপক কর্মসূচি নিতে হবে এ সকল কথা। সাধারণের বোধগম্য বাংলায় অভিযোজন মানে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে বাঁচা; প্রশমন মানে কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করা এবং অভিবাসন অর্থ দাঁড়ায় এলাকায় টিকতে না পেরে অন্যত্র যাওয়া। এই সকল সেমিনারপত্রে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কত সংখ্যক বাসিন্দা পরিস্থিতির শিকারে পড়ে পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য

হয়েছেন অথবা এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তার বিবরণ থাকে। তবে পরিবেশগত যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে তার ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান ও সমস্যা সমাধানে তাদের মাথা ব্যথা নেই। এ ক্ষেত্রে এডিবি বা বিশ্ব ব্যাংক যে সব কথা বলে এসেছে কেবল তারই পুনরাবৃত্তি করা হয়ে থাকে। এদেশে ক্রুগমিশন প্রস্তাব বাস্তবায়নের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে তাদের সকলেই মুখে কুলুপ এটে রেখেছেন।

খুলনার বিভাগীয় অবসরপ্রাপ্ত মৎস্যকর্মকর্তা (মানোন্নয়ন) প্রফুল্ল কুমার সরকার একটা সেমিনারে বলেছিলেন, কর্ডনগুলি একেকটি উঁচু কান্দাওয়ালা গামলায় পরিণত হয়ে গেছে। গামলার ফুটোগুলো পরিকল্পনামাফিক জলকপাট লাগিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো পূর্বে ছিল ছোট বড় খাল-নদী-নালা। বাসিন্দারা বাস করছেন গামলার খোলে। গর্তের ভেতর। গামলার খোলগুলো উপকূলীয় বাঁধের অন্তত ১৩ ফুট নিচে পড়ে আছে। কোন কারণে কোথাও বিলকান্দার বাঁধ ভেঙে গেলে মানুষগুলিকে গর্তের মধ্যে হাবুডুবু খেতে হবে। খালের মুখে কপাটে উক্ত মৎস্যকর্মকর্তা আপত্তি তুলেছিলেন; কারণ পূর্বে খালগুলোর মাধ্যমে নদীর সাথে বিলের স্বাভাবিক সংযোগ থাকতো। এখন খালের মুখে কংক্রিটের কপাট বসানোর ফলে সেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এর জন্য মাছের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাছই শুধু নয়, এতে ক্ষতি হয়েছে নানা প্রকার শৈবাল, উদ্ভিদ ও বিচিত্র প্রাণিকুলের ।

উপরের বিবরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, পোল্ডারের ভেতরের বাসিন্দারা কী পরিস্থিতে বেঁচে আছেন! ব-দ্বীপ প্রকৃতির সাথে মিলেমিশেই তো মানুষ হাজার হাজার বছর এদেশে বসবাস করে এসেছেন। তাই বলে এই গামলা-পরিস্থিতি আগে কখনও ছিল না।

আইপিসিসি প্রশ্নবিদ্ধ

সমুদ্র-সমতলের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ সাগরের নিচে তলিয়ে যাবে, ঢালাওভাবে আন্তঃপ্রশাসনিক প্যানেল-আইপিসিসির এ তত্ত্বও অনেকটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ সম্পর্কে ২০১০ সালের ১০ ফেব্রুয়রি ইত্তেফাক পত্রিকায় 'বাংলাদেশ ডুবছে না' শিরোনামে প্রতাপ চন্দ্রের একটা লেখা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, সমুদ্র-সমতলের উচ্চতা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির তত্ত্বকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কিছুটা

ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোর প্রবণতা ধরা পড়েছে। এই তত্ত্বের প্রয়োজনে তথ্য সমাবেশের লুকোচুরির বিষয়ও অতি সাবধানতার কুহক ভেদ করে সত্য ফাঁস হয়ে পড়ার পর সিআরইউ-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মি. ফিল জোন্স পদত্যাগ করেন এবং সভাপতি মি. রাজেন্দ্র পাচুরি ভুল স্বীকার করলেও অন্যের স্কন্ধে তথ্য বিভ্রাটের দায় চাপিয়ে দিয়ে পদত্যাগ না করার জেদ বজায় রেখেছেন।

যাহোক, জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ অবদি যে সকল প্রস্তাব, আবেদন বা দাবি উত্থাপিত হয়েছে তার যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা বিচারের আগে এ বিষয়ে আমাদের আরও কিছু তথ্য বিবেচনায় রাখতে হবে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

২১ মার্চ ২০১০ *প্রথম আলো* পত্রিকায় 'সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশ' শিরোনামে দীপেন ভট্টাচার্যের একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে তার অংশবিশেষ তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি। তিনি লিখেছেন, এখন থেকে ৭-৮ হাজার বছর আগে দ্রুত সমুদ্র-সমতলের উচ্চতা বৃদ্ধির সমাপ্তি ঘটে। এরপর সমুদ্রপৃষ্ঠ গড়ে বছরে ১ মিটার বা তারও কম হারে বাড়তে থাকে। ফলে গত ৭ হাজার বছরে বিশ্বব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ৬ মিটার বেড়েছে। বর্তমানে ধরা হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠ প্রতিবছর ২ থেকে ৩ মিলিমিটার হারে বাড়ছে। এই বৃদ্ধির প্রধান ২টি কারণ হচ্ছে :

১. বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রার দ্রুত বৃদ্ধি যে কারণে মহাদেশীয় ভূ-খন্ডের ওপর অবস্থিত হিমবাহের দ্রুত গলন ও বরফগলা জলের সমুদ্রে পতন এবং
২. সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিকভাবে সমুদ্রের জল ফেপে ওঠা।

বাংলাদেশের উপকূলে উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৪ থেকে ৮ মিলিমিটার বলে উল্লেখ আছে যা বিশ্বের অন্যান্য অংশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি। এমনকি বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও আরব সাগরের সীমানায় অবস্থিত বিশাখাপত্তম, চেন্নাই, মুম্বাই, করাচি ও এডেনে দীর্ঘমেয়াদি (৪০ বছরের) জোয়ার-ভাটার তথ্যে এই উচ্চতা বৃদ্ধির হার বছরে ২ মিলিমিটারের কম বলে দেখানো হচ্ছে। অন্যদিকে জোয়ারের তথ্য পশ্চিমবঙ্গের হুগলি

নদীর মোহনায় ডায়মন্ড হারবারে উচ্চতা বৃদ্ধির হার দেখাচ্ছে ৬ মিলিমিটারের কাছাকাছি।

এই সকল গবেষণা থেকে যদি ধরে নেয়া হয় যে, বাংলাদেশের উপকূলে সমুদ্র-সমতলেন উচ্চতাবৃদ্ধির হার নিকটবর্তী অন্যান্য এলাকা থেকে বেশি, তাহলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাধারণ নিয়ম এখানে খাটে না। এর কারণ হিসাবে ভূ-তাত্ত্বিকেরা বাংলাদেশের ভূমির অবনমনকে দায়ী করেছেন।

বাংলাদেশের উপকূলে সমুদ্র-সমতলের উচ্চতা বৃদ্ধির সঠিক পরিমাণ যাচাই এবং সার্বিক ও স্থানীয় অবনমনের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য এখনও অনেক গবেষণার প্রয়োজন আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি গবেষণায় কক্সবাজার উপকূলে সমুদ্র-সমতলের উচ্চতা বাড়ার হার বছরে ৮ মিমি পাওয়া যাচ্ছে; অথচ সেই তুলনায় কক্সবাজার অঞ্চল দ্রুত সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে এমন কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি।

অবনমন

এছাড়া বঙ্গীয় ব-দ্বীপের ভূমি অবনমনের তিনটি কারণে হয় বলে ধারনা করা হয়: ১) টেকটনিক প্লেটের ওপর বাংলাদেশের অবস্থান সেটাই ধীরে ধীরে নামছে; ২) ভূমির ওপর পলি পড়ে গভীরের মাটি থেকে পানি বের করে মাটিকে ঘনীভূত করে তাকে নামিয়ে দিচ্ছে; এবং ৩) পানি ও কৃষিকাজের জন্য নদী ও ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য ধীরে ধীরে উপরিভাগের মাটি নীচে নেমে যাচ্ছে। অবনমন ও পলিপড়ার সাম্যাবস্থার কারণেই বাংলাদেশের ভূমি যে পলি পড়ে উঁচু হবে, তাতে আর পলি পড়বে না, তখন প্রাকৃতিক অবনমনের জন্য সেই জমি আবার নিচু হতে থাকবে, যতক্ষণ না আবার পলি পড়ে উঁচু হচ্ছে। তাই, বন্যা-অববাহিকায় জমির উচ্চতা কখনই একটা নির্দিষ্ট মানের ওপর উঠতে পারে না। অন্যদিকে এটিই সাম্যাবস্থার জন্য এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার দ্রুত বৃদ্ধি না হওয়ার সাপেক্ষে (বছরে ১ মিমি বা তার কাছাকাছি) বাংলাদেশের উপকূল রেখা মোটামুটি স্থির আছে অন্তত গত কয়েক হাজার বছরের বাংলার ভূ-ভাগের ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়।

ভূ-তত্ত্ববিদদের হিসাব, বাংলাদেশের বিরাট অংশ বছরে ১ থেকে ৫ মিলিমিটার দেবে যাচ্ছে। পলিগঠিত মাটির বন্ধন দৃঢ় না হওয়ার কারণে ক্রমাগত বায়ু, উপরের মাটি এবং পানির চাপে মাটির এই অবনমন ঘটে। সুন্দরবনের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানকার জোবামাটি অপরাপর

এলাকার মাটি অপেক্ষা অধিকতর আলগা। এখানকার অবনমন সাধারণ হার অপেক্ষা বেশি। সতীশ চন্দ্র মিত্র *'যশোর খুলনার ইতিহাস'* গ্রন্থে সুন্দরবন অঞ্চলের **আকস্মিক অবনমন** সম্পর্কে অনেক তথ্য তুলে ধরেছেন। সেসব বিবরণ পাওয়া যায় *Gastrel`s Statistical Report of the District of Jessore, Faridpur and Bakherganj (1864), R. D. Oldman`s Manual of Geology (1893), R. K. Mukherjee`s Changing Face of Bengal (1938), Calcutta Review : The Gangetic Delta (1850), Mr.J. Fergusson`s paper on the delta of the Ganges published in the Quarterly Journal of the Geogrphical Society -1863 and Khulna Guazzetter* প্রভৃতি পুরাতন গবেষণায়। উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে *সুন্দরবনের উত্থান ও পতন* ভাগে তিনি লিখেছেন, "সুন্দরবনের জমি বসিয়া যায়...। হঠাৎ সুন্দরবনের কোনও অংশবিশেষ এমনভাবে ডুবিয়া যায় যে, ঐ প্রদেশে যে সমস্ত লোকের বসতি ছিল বা অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল, তাহা সমস্তই অধোগত বা জলনিমগ্ন হইয়া লোকের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। .... বহু বৎসরের ইতিহাসের পর্যালোচনার দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, সুন্দরবনে ২/৩ বার ভীষণ অবনমন (subsidence) হইয়াছিল।" ...

অতলস্পর্শের প্রভাব

তিনি আরও লিখেছেন, "ভূ-তাত্ত্বিক কারণ হিসাবে জানা যায়, সুন্দরবনের মালঞ্চ মোহনার ৭৫ মাইল দক্ষিণ ২১-২২ ডিগ্রি অক্ষরেখার মধ্যবর্তী এক স্থানে অতলস্পর্শ (Swatch of No Ground) আছে। ঐ স্থানের চারিদিকে ৫০-৬০ ফুট গভীর, কিন্তু অতলস্পর্শের গভীরতা হঠাৎ ১৭/১৮ শত ফুট। ভূ-তত্ত্ববিদ ফার্গুসনের পর্যবেক্ষণ বিবরণী 'বঙ্গোপসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম দিক হইতে বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাত ঐ স্থানের আবর্তন সৃষ্টি করিয়াছে; সুতরাং সেখানে কোন প্রকার মাটি পড়িলে জমিতে পারে না। ঘূর্ণায়মান মৃত্তিকা সুন্দরবনের দক্ষিণোপকূলে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভরবৃদ্ধি করে, আর তার কিছু সাগরের মধ্যে দূরবর্তী স্থানে দ্বীপ গঠন করিতেছে। বঙ্গোপসাগরে পড়িবার কালে সকল নদীরই গতি ঐ অতলস্পর্শের দিকে প্রবর্তিত দেখিতে পাওয়া যায়; এজন্য সুন্দরবনের দক্ষিণের নদীমুখে যে সকল চর পড়িয়াছে, তাহাদের অগ্রভাগই অতলস্পর্শমুখী রহিয়াছে; পূর্ব দিকের চরের মুখ পশ্চিম দিকে এবং পশ্চিম দিকের চরের মুখ পূর্বাভিমুখে আছে; সুন্দরবনের ভূ-পঞ্জরের নিম্নদেশ হইতে কর্দমবৎ মৃত্তিকা অবিরত অল্পে অল্পে ধুইয়া স্রোতের গতি অনুসারে অতলস্পর্শের গহ্বরে পড়িতেছে; এইরূপ বহুদিন পর্যন্ত নিম্নস্থ

জঙ্গলাকীর্ণ ভূ-ভাগের অতিরিক্ত গুরুভার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিকে একস্থানে বসাইয়া দেয়। জমি নিম্ন হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ জলপ্লাবনে সে দেশ ডুবিয়া যায় এবং সে জলের সহিত মিশ্রিত পলি ক্রমে স্থির হইয়া নিম্নে পড়িতে থাকে ও জমির উচ্চতা সম্পাদন করে। অতলস্পর্শের জন্য এই ভাবে সুন্দরবনের উত্থান-পতন হয়। সুতরাং এই অতলস্পর্শ সুন্দরবনের অবনমন ও তজ্জন্য সাময়িক ধ্বংসের প্রথম ও প্রধান কারণ।"

ভূমিকম্প ঝড় জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবে, এ জাতীয় আশঙ্কায় হতবাক হওয়ার আগে আরেকবার অতীত দিনের কিছু তথ্য সামনে রাখা সমীচীন মনে করি। সতীশ চন্দ্র মিত্র আরও লিখেছেন, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্পের কারণে সুন্দরবনে বহু বিপর্যয় ঘটেছে। বহু বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনার প্রমাণিত হয়েছে যে, সুন্দরবনে দু'তিনবার ভীষণ অবনমন (Subsidence) হয়েছে। এখানে বিভিন্ন পয়েন্টে ৩০/৪০ ফুট মাটির নিচে বহু সংখ্যক সুন্দরি গাছের গুড়ির সন্ধান মিলেছে যা আকস্মিক অমনমনের ফল বলেই ভূ-তত্ত্ববিদরা মনে করেন। তাছাড়া প্রচণ্ড ঝড়তুফানে বহুবার সুন্দরবন জলনিমগ্ন হয়েছে। ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে তিনি লিখেছেন, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮৫ সালে একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল। ছোট বড় ঝড় তুফান ছাড়াও ১৬৮৮, ১৭০৭, ১৮৬২, ১৮৬৪, ১৮৭৬, ১৯০৯ ও ১৯১৯ সালে সংঘটিত প্রবল ঝড় জলোচ্ছ্বাসের ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া য়ায়। বিধ্বংসী ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে বহুবার; যেমন ১৭৩৭, ১৭৬২, ১৮১০, ১৮২৯, ১৮৪২ এবং ১৮৯৭ সালে বিধ্বংসী ভূমিকম্পে বার বার সুন্দরবন জলনিমগ্ন হয়েছে। এছাড়া কপিল ভট্টাচার্যের'বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালের আশ্বিনে ঝড়ের কথা। প্রতি ১৬ বছরে একটি করে মহাদুর্যোগ। অধ্যাপক নলিনীকান্ত ভট্টশীলের কথায় ষোড়শ শতাব্দীতে সমস্ত সুন্দরবন এলাকায় মাটি ধসে বসে যায় আর সেই সঙ্গে ওখানকার জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ছোট খাট নিম্নচাপের কথা ছেড়ে দিলেও এ জাতীয় অতীত দুর্বিপাকের ঘটনাগুলিকে অবশ্যই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ুপরিবর্তনের ফল হিসাবে দেখার সুযোগ নেই। নদীর প্রবাহ ও পরিবেশ বিপর্যয়ের পিছনে মানুষের হস্তক্ষেপ কম দায়ী নয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য মূলত বার বার মানুষের হস্তক্ষেপ ঘটে চলেছে ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়।

নদীর ওপর হস্তক্ষেপ

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনের পথ খুঁজতে এখানকার নদী-কাঠামো কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সে বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। অঞ্চলের নদীসমস্যার সূত্রপাত ব্রিটিশ আমলে আসাম-বেঙ্গল রেললাইন পাতানোর পর থেকে। তৎপূর্বেমূলত ব্রিটিশ বণিকেরা লাভের কথা হিসাবে নিয়ে তাদের নিজস্ব অর্থে বাণিজ্য ও যোগাযোগের উন্নতির জন্য ভারতে বড় আকারের নদীসংস্কারের কাজ হাতে দিয়েছিলেন। ব্রিটিশরা দক্ষিণ ভারতে নর্মদা নদীর ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। গঙ্গা নদীর সংস্কারেও তারা হাত দিয়েছিলেন। ভারতে রেললাইন প্রচলনের সময় ইংরেজের নদী সংস্কারের কর্মসূচি থেমে যায়। এ সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায় রমেশ চন্দ্র মজুমদারের 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থে। রেললাইন পাতানোর পর ব্রিটিশ বণিক গোষ্ঠি বা সরকার কোনও পক্ষই আর নদী সংস্কারে উৎসাহ দেখায় নি। যোগাযোগ এবং পরিবহণের উপায় হিসাবে তাদের কাছে নদীর চেয়ে রেল অধিকতর গুরুত্ব পায়। ১৮৬১ সালে কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ১৭০ কিলোমিটার রেল বসানো হয়। এই রেল লাইনের একটি অংশ পড়ে বর্তমান চুয়াডাঙ্গা জেলার মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্ব তীর বরাবর। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শক্তিশালী নদ ভৈরব গঙ্গার শাখা। মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি থেকে উৎপন্ন হয়ে ভৈরব বর্তমান মেহেরপুর জেলার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং দর্শনা শহরের আট কিলোমিটার উজানে জয়রামপুর স্টেশনের নিকট সুবলপুরে মাথাভঙ্গার সাথে যুক্ত হয়েছে। ভৈরব ও মাথাভাঙ্গার মিলিত প্রবাহ দর্শনা পর্যন্ত এসে ভৈরব পুনরায় মাথাভাঙ্গা থেকে বিযুক্ত হয়ে জীবননগর, কোটচাঁদপুর, তাহেরপুর হয়ে যশোর শহর স্পর্শ করে খুলনার দিকে প্রবাহিত হয়েছে। ভৈরবই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান নদ। মধুমতি, কুমার, নবগঙ্গা ও হিস্না বাদে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সব নদনদী ভৈরবের শাখা বা প্রশাখা। তাই ভৈরবকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান নদ বলার চেয়ে প্রধান নদী কাঠামো (River system) বলা হয়। এ অঞ্চলের অপরাপর সকল নদনদী ভৈরব থেকে পানি নিয়ে সুন্দরবনের ভেতরে দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। রেল লাইন বসানোর সময় দর্শনায় ভৈরব নদের মুখে একটি সঙ্কীর্ণ ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়া ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা থেকে উৎপন্ন চিত্রা, নবগঙ্গা, কুমার নদীর মুখে মুখে অনুরূপ সংকীর্ণ ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। নদীগুলির প্রবাহের তুলনায় ব্রিজগুলি হয়ে যায় খুবই সঙ্কীর্ণ। এই রেলব্রিজগুলি নির্মাণের পর থেকে ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা নদীর শাখাগুলির প্রবাহ কমতে থাকে। আবার এই

ব্রিজগলির নিচে পলি জমে নদীগুলির প্রবাহ দারুন ভাবে হ্রাস পেতে থাকে। অচিরেই নদীগুলির প্রবাহ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। কোন কোনটির প্রবাহ এক সময় বন্ধ হয়ে যায় এবং মাথাভাঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন থেকে কেবল মাত্র দর্শনার সঙ্কীর্ণ রেলব্রিজের ভেতর দিয়ে বর্ষাকালে ভৈরবে সামান্য পরিমাণ গঙ্গার পানি ঢুকতে পারত। উক্ত ব্রিজগুলি নির্মাণের আটাত্তর বছর পর দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ১৯৩৮ সালে। ঐ বছর দর্শনায় ভৈরবের বুক ভরাট করে কেরুর চিনিকল স্থাপন করা হয়। সেই থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল একেবারে রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে এড়িয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী ও পানি সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বর্ষাকালে দর্শনার রেলব্রিজের নিচে দিয়ে এবং মাথাভাঙ্গার উৎসমুখের ভাটিতে উৎপন্ন হিস্না নদী দিয়ে যতটুকু গঙ্গার পানি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশ করতে পারত ১৯৬০ সালে জিকে প্রজেক্ট বাস্তবায়ন ও মাগুরায় নবগঙ্গার ওপর গেট নির্মাণের পর থেকে তাও বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ১৮৮৩ সালে কলকাতা-খুলনা রেল লাইন বসানোর সময় যশোর পর্যন্ত পর যমুনা, ইছামতি, কোদলা, বেতনা, কপোতাক্ষ, হরিহর ও মুক্তেশ্বরী নদীর ওপর একই রকম সংকীর্ণ ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ করে প্রবাহগুলিকে ব্যাপকভাবে সংকুচিত করা হয়েছে। ঝিকরগাছার পূর্ব প্রান্তে লাউজানিতে হরিহর নদের ওপর মাত্র সাত ফুট একটি কালভার্ট নির্মাণ করে নদটিকে কার্যতঃ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যশোর শহরের পশ্চিম প্রান্তে পুলেরহাটে মুক্তেশ্বরী নদীকেও ছোট্ট একটি ব্রিজ নির্মাণ করে আটকে দেওয়া হয়। তাছাড়া পশ্চিম-দক্ষিণমুখি সমান্তরাল ভূমিঢাল সমূহ দিয়ে পানিপ্রবাহের যে স্বাভাবিক পথ ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে যায় রেল লাইন বসানোর পর থেকে। পানি প্রবাহের প্রয়োজনীয় পথগুলি চিরতরে বন্ধ হয়ে পড়ে। ফলে যে সকল নদনদী সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে তার সবগুলিই এখন উজানের প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপকূলীয় খাতে পরিণত হয়েছে। তাদের বর্তমান অস্তিত্ব কেবল মাত্র জোয়ারভাটা নির্ভর হয়ে পড়েছে। আর বর্ষার কয়েক মাস অববাহিকায় যে বৃষ্টিপাত হয় কেবল সেটুকুই এই সব নদী বহন করে। বিপরীত ক্রিয়ায় এ অঞ্চলের নদীতে বেড়েছে জোয়ারের তীব্রতা। বেড়েছে লবণাক্ততা। সেই সাথে এ অঞ্চলের নদীখাতগুলি দিয়ে প্রতিটি জোয়ারে উঠে আসে বিপুল পরিমাণে সাগরের পলি। তরল ভাসমান পলি, কাদার মতো গোলা পলি এবং মণ্ডপলি নদীর মোহনা অংশে জমতে থাকে। প্রতিদিন দু'বার করে প্রতিটি জোয়ারে উঠে আসা এই সব পলি নদীর তলদেশে জমে জমে কেবলই মোহনাগুলি ভরাট করে দিচ্ছে। সমুদ্রের

পানিতে প্রচুর লবণ। লোনা পানি বিলে প্রবেশ করে মাটিকে লবণাক্ত করে তোলে। ক্রমে তল্লাটের জমি হয়ে পড়ে চাষাবাদের জন্য অনুযোগী। এরই ফলে ১৯৫০ সালের সমসাময়িক কালে ক্ষতিকর লোনা পানির প্রভাবে যশোরের দক্ষিণাংশ, খুলনার পশ্চিমাংশ এবং সাতক্ষীরা জেলার অধিকাংশ এলাকায় বছরের পর বছর ফসলহানি ঘটতে থাকে। সে কারণে দশ এগারো বছর এলাকায় প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। তাই এ অঞ্চলে নদীকে কেন্দ্র করে অতীতে যে সকল ঘটনা ঘটেছে সে সব বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ বিপর্যয়কে ঢালাওভাবে জলবায়ুর অভিঘাত বলে চালিয়ে দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই।

নেদারল্যান্ডের অভিজ্ঞতা

ডেল্টাপ্লান ২১০০-এ জোর দিয়ে দেখানো হয়েছে, নেদারল্যান্ডের বাঁধ ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের বন্যা, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা নিরসনের উপায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া ভালো। তাই বলে বিবেচনায় রাখতে হবে নেদারল্যান্ডের নদী ও ভূ-প্রকৃতি আর গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নদী ও ভূ-প্রকৃতি এক নয়। নেদারল্যান্ডের নদী কঠিন প্রস্তরাকীর্ণ অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। তাই নেদারল্যান্ডের নদী খুব সামান্য পরিমাণ পলি বহন করে। বাংলাদেশের ভূমি পলি দ্বারা গঠিত। পাললিক শিলায় গড়ে উঠা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয় থেকে উৎপন্ন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নদীগুলো প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ পলি বহন করে আনে। নেদারল্যান্ডের এক-পঞ্চমাংশ ভূমি সমুদ্র-সমতলের নিচে অবস্থিত; বাংলাদেশের কোন ভূমি সমুদ্র-সমতলের নিচে অবস্থিত নয়। নেদারল্যান্ডের নদীসমূহের পানিপ্রবাহের তুলনায় বাংলাদেশের নদনদীসমূহের প্রবাহ বিপুল। আবার নেদারল্যান্ডে সারা বছর বৃষ্টিপাত প্রায় একই রকম থাকে। তাই সারা বছর সেখানকার নদীসমূহের প্রবাহ প্রায় একই রকম থাকে। বাংলাদেশে ঋতুভেদে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ চরমভাবে ওঠানামা করে। শুকা মৌসুমে নয় মাস বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। সেই তুলনায় বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে সারা বছর যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তার ৮৫ ভাগই হয় বর্ষাকালে মাত্র তিন অথবা চার মাসে। বাকি পনের ভাগ বৃষ্টি হয় আট নয় মাসে। তাই শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের নদীসমূহে পানির প্রবাহ দারুন ভাবে হ্রাস পায়। আবার বর্ষাকালে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের দরুন নদীতে প্রচণ্ড হারে

পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বর্ষা কালে ভারতের উত্তর প্রদেশ, বিহার রাজ্যে সংঘটিত বৃষ্টির পানি, নেপাল, ভুটান ও তিব্বত থেকে নেমে আসা বৃষ্টির পানি ধেয়ে আসে নিচের দিকে। উত্তর প্রদ্রেম, বিহার, পশ্চিমবাংলা, আসাম, ভুটানে বন্যা হলেই বুঝতে হবে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশ ভেসে যাবে। প্রতি বছর তাই নদীর পাড় উপচানো পানিতে বাংলাদেশের কোনও না কোনও এলাকা প্লাবিত হয়। নেদারল্যান্ডের সমস্যা সমুদ্রের প্লাবন। বাংলাদেশের সমস্যা নদীর প্লাবন। নেদারল্যান্ডের করণীয় হলো পোল্ডারসমূহ রক্ষার। বাংলাদেশের ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনার মূল করণীয় হলো বর্ষাকালের নদীসমূহের বিপুল জলরাশির সুষম বিস্তৃতিকরণ যাতে প্লাবন ভূমিতে পানি ও পলি সুষমভাবে বিস্তৃত হতে পার এবং বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে সুবিধা হয়। তাই নেদারল্যান্ডের বাঁধ প্রকল্পের কার্বনকপি বাংলাদেশে খাঁটে না। বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণে হুবহু নেদারল্যান্ডকে অনুসরণ বিপুল ক্ষতির কারণ হবে বিলক্ষণ। তাছাড়া ইদানিং নেদাল্যান্ডেও চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে। ২০০৬ সাল থেকে নেদারল্যান্ডে 'রুম ফর রিভার্স' প্রোগ্রামে কর্ডনগুলি অপসারণ করে প্লাবনভূমির বেশি অংশ নদীপ্রবাহের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। তার থেকেও আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতাম! কিন্তু ডেল্টা ২১০০ প্রোগ্রামে নেদারল্যান্ডের 'রুম ফর রিভার্স' নীতি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কেন এবং কী কারণে তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা প্রশ্নে ডেল্টা প্লান - ২১০০

ডেল্টাপ্লান-২১০০ পর্যবেক্ষণ বলছে, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, নোয়াখালী জেলার জলাবদ্ধতার সমস্যাটি ভিন্ন ভিন্ন কারণের ফল। বলা হয়েছে, উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান পোল্ডারসমূহ স্বাভাবিক জোয়ারের প্রবাহ অববাহিকায় ছড়িয়ে যেতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার ফলে জোয়ারবাহিত পলি নিম্নভূমিতে পড়ছে না। পলি জমছে নদীতে। নদীর বুক ভরাট হয়ে উঠছে। জোয়ারবিধৌত এলাকা (Tidal Prism) সঙ্কুচিত হচ্ছে। নদীর স্বাভাবিক নিষ্কাশন ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে পোল্ডার পরিকাঠামো কোনও কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারে নি। জলকপাটগুলিও অকার্যকর হয়ে পড়ছে। ডেল্টা২১০০-এর মূল্যায়ন হলো উপরি উক্ত কারণে উপকূল এলাকায় বিদ্যমান পোল্ডারের মধ্যে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পোল্ডারের মধ্যে আড়া আড়ি চলাচলের রাস্তা নির্মাণও জলাবদ্ধতার সৃষ্টির জন্য দায়ী। পর্যবেক্ষণের এ সব কথা পুরাপুরি সত্য। এ

ধরনের অকাট্য তথ্য থাকার পরও ডেল্টা প্লান ২১০০ এর সমস্যা সমাধানে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তা স্ববিরোধী। ২৮৩ পৃষ্ঠায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতার কারণ হিসাবে পোল্ডার ব্যবস্থাকে দায়ী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে পোল্ডারের কারণে অপ্রতুল নিষ্কাশন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং ফলে নদীসমূহের প্রবাহ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ডেল্টা ২১০০-এর প্রস্তাবনার ৪০৫ পৃষ্ঠায় এর ঠিক উল্টা কথা বলা হয়েছে। যেমন সমস্যা নিরসনে এবং মৎস্য ও কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে তটভূমিতে উচ্চ ও নিম্ন জলতলের মধ্যকার উচ্চভূমি ও পোল্ডার সমূহের নিবিড় তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। পোল্ডারগুলি মজবুত করতে হবে। বলা হয়েছে সেগুলি আরও উঁচু করতে হবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতার স্থায়ী নিরসনে একমাত্র উপায় হিসাবে আবার পোল্ডার সমূহ উঁচুকরণ সহ যথাযথ ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবনার এই অংশে নদীর গভীরতা ও প্রবাহক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এছাড়া জলাভূমি রক্ষার ওজুহাতে কপালিয়ার টিআরএম বাতিল করা হয়েছে। আপৎকালীন সময়ের জন্য পোল্ডার এলাকায় বিলের জমির উচ্চতা বৃদ্ধি ও জোয়ারের ভরবেগ কাজে লাগিয়ে জলাবদ্ধতার নিরসন ও নদীর গভীরতা বৃদ্ধিতে উপযুক্ত সহায়ক হিসাবে টিআরএম-এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। এখন এসব কিছু উপেক্ষা করে বিল কপালিয়ার টিআরএম প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে।

পরিকল্পিত জোয়ারাধার

সর্বজনবিদিত যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার জলাবদ্ধতা নিরসনে জোয়ারাধার (Tidal River Management-TRM) প্রকল্প একটি কার্যকরি ভূমিকা রাখছে। ডাকাতিয়া, ভরতভায়না, ডহরির বাঁধ কেটে জলাবদ্ধতার সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার ঘটনা বিবেচনায় নিয়ে ১৯৯৮ সালে ১৭ জানুয়ারি যশোরে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ১৭টি কৃষক সংগঠন ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে একটি মতবিনিময় সভায় জলাবদ্ধতা নিরসনে কৃষকদের নিজস্ব পদ্ধতি অষ্টমাসি বাঁধের আদলে পরিকল্পিত জোয়ারাধার-পদ্ধতির বিষয় আলোচিত হয়। অতীতে এ অঞ্চলের রেওয়াজ ছিল অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান কাটার পর বিলসংযোগের খালের মুখে বাঁধ দিয়ে নোনা পানি ঠেকিয়ে বোরো ধানের আবাদ করা হতো।

বোরো কেটে সানে আউশ-আমন অথবা জলি আমন বা বাওড়া বোনা হতো। সে ধান একটু বেড়ে উঠলে শ্রাবণের শুরুতে বাঁধ কেটে নদীগুলি অবাধ করে দেওয়া হতো। স্থানীয় ভাষায় এই পদ্ধতির নাম ছিল অষ্টমাসি বাঁধ। উক্ত সভায় পরিবেশ বিজ্ঞানী প্রফেসার ড. আইনুন নিশাদ, অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. স্বপন আদনান, প্রকৌশলী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ সভাতে স্থানীয় কৃষকদের উদ্ভাবিত অষ্টমাসি বাঁধ পদ্ধতির আদলে জোয়ারাধার পদ্ধতি পুনরায় চালুর দাবি উঠে। এর কিছু দিন পর তৎকালীন পানি সম্পদ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে যশোর জেলা প্রশাসকের সভা কক্ষে সরকারি উদ্যোগে অপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অষ্টমাসি বাঁধ বা জোয়ারাধার পদ্ধতি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়। এ পদ্ধতির নতুন নামাকরণ করা হয় জোয়ারাধার বা টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট (Tidal River Management-TRM)।

টিআরএম অভিজ্ঞতা

টিআরএম পদ্ধতিতে জোয়ারের পানি প্রবেশ করিয়ে ভবদহ এলাকায় খুক্শিয়া বিলের ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলাবদ্ধতা নিরসনে টিআরএম একটি সফল পদ্ধতি বলে প্রমাণিত হয়েছে। ২০০১ সালে সর্বপ্রথম যশোরের অভয়নগর উপজেলার কেদারিয়া বিলে টিআরএম চালু হয়। নানাবিধ ত্রুটির কারণে বিলে পলিভরাটের কাজ আশানুরূপ ভাবে সফল হয়নি। তা না হলেও নদীর ভরবেগ বেড়েছিল। সেই হারে বেড়েছিল নদীর গভীরতা। আবার নানাপ্রকার সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী টিআরএম খুক্শিয়া বিলে পলিভরাট হয়ে ভূমির উচ্চতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অদ্যাবধি যশোর-খুলনার এই অংশ যে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত আছে তার প্রধান কারিগর টিআরএম পদ্ধতি। এ এলাকায় পরবর্তী টিআরএম প্রকল্প চালু হওয়ার কথা কপালিয়া বিলে। কিন্তু নানাবিধ স্বার্থের সংঘাতে কপালিয়া বিলে টিআরএম বাধাগ্রস্ত হয়ে আছে। তবে অন্যত্র সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার কপোতাক্ষ পাড়ে পাখিমারা বিলে টিআরএম এখন চলমান। এখানেও একদিকে পলিসমৃদ্ধ জোয়ার পানি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধ বিলের তলদেশ উঁচু করিয়ে নেওয়ার কাজ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছে। অপরদিকে তালায় যেখানে হেঁটে অথবা সাইকেল ঠেলে নদী পার হওয়া যেতো, সেখানে এখন কপোতাক্ষের গভীরতা বেড়েছে ৩০ থেকে ৪০ ফুট।

এটা সম্ভব হয়েছে টিআরএম-এর বিলে তীব্র গতিতে জোয়ার উঠায় নদীর ভরবেগ বাড়ার কারণে। নদীগর্ভে অনেক বছরের জমে থাকা মণ্ডপলি ভাটার টানে সাগরে নেমে যাচ্ছে। এর জন্য নদীর গভীরতা বাড়ছে। তাই সফল ভাবে প্রমাণিত হয় যে, টিআরএম পদ্ধতিতে নদীর মোহনায় দীর্ঘদিন ধরে জমে ওঠা মণ্ডপলি সরিয়ে দিয়ে অবরুদ্ধ মুখ খুলে দেওয়া সম্ভব। প্রমাণিত হয়েছে আজ পর্যন্ত উদ্ভাবিত টিআরএম পদ্ধতিই মোহনা অংশে বদ্ধ হয়ে থাকা নদীর পুনর্জাগরণে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।

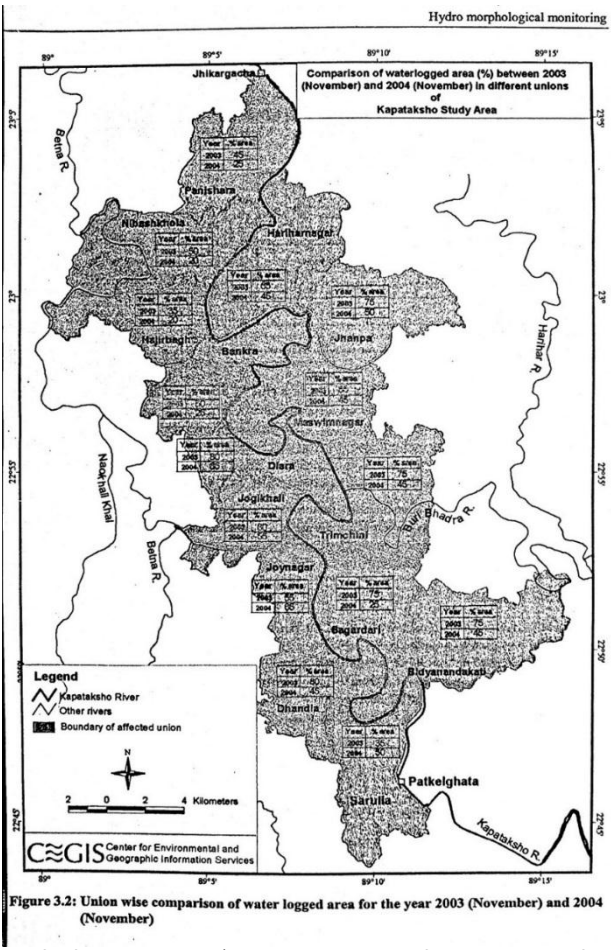

Figure 3.2: Union wise comparison of water logged area for the year 2003 (November) and 2004 (November)

চিত্র ৩ : সিইজিআইএস-এর পর্যবেক্ষণে কপোতাক্ষ অববাহিকার জলাবদ্ধতার চিত্র।

ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র

ভবদহ, কপোতাক্ষ সহ উপকূলীয় অঞ্চলে টিআরএম পদ্ধতি নদীর নাব্যতা রক্ষা, জলাবদ্ধতা নিরসন ও ভূমিগঠনে সাফল্যজনক ভূমিকা রেখেছে। এবার আসা যাক, ভবদহ অঞ্চলের জলাভূমির কথায়। পত্রপত্রিকা ও অন্যন্য সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের সুবাদে দেশবাসী অবগত আছেন যে, ভবদহ এলাকা এক গভীর জলাবদ্ধতার সংকটে নিমজ্জিত। সরকারি সিদ্ধান্ত ছিল, বিল খুক্‌শিয়ার পর বিল কপালিয়ায় টিআরএম হবে। সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একের পর এক অনেক ধরনের বাধা এসে হাজির হয়। এলাকার জনগণের দাবিদাওয়া ও আন্দোলনের চাপে এক পর্যায়ে পানি-সম্পদ মন্ত্রী এখানে টিআরএম-এ রাজি হন। কিন্তু এবার বাদ সাধলেন বিভাগীয় সচিব। জলাভূমি রক্ষার প্রশ্ন তুলে বিল কপালিয়ার টিআরএম প্রকল্প বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃত সত্য হলো, ভবদহ এলাকা কোনদিনও প্রাকৃতিক জলাভূমি ছিল না। বিলের তলি বাদে এখানে সব জমিই ছিল দো-ফসলা-তিনফসলা। কখনও তা সরকারি 'জলাশয়' তালিকাভুক্তও নয়। মন্ত্রণালয়ের টিআরএম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত যাচাই বাছাই কমিটির ২৬/০৯/২০১৮ তারিখের সভায় টিআরএম প্রকল্প বাতিল করা হয়। বলা হয়, 'টিআরএম ব্যবস্থাপনার চেয়ে অনেক কম খরচে এবং পরিবেশের ক্ষতি না করে প্রকল্প এলাকার সকল খাল/নদীখনন/পুনঃখনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেজিং করে নদীর পানি ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি, নাব্যতা রক্ষা এবং পানি নিষ্কাশন সচল রেখে ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সকল খাল/নদী খনন/পুনঃখনন করে পুরো সিস্টেমে পানি ধারণক্ষমতা, প্রবাহ ও নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিস্তারিত স্টাডি করে বড় প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। তবে কিছু জায়গায় 'সার্কুলেটেড ওয়াটার ফ্লো'-এর সংস্থান রাখা যেতে পারে। উপরোক্ত সিদ্ধান্তে কপোতাক্ষ পাড়ে পাখিমারা বিলে চলমান টিআরএম সহ এলাকার প্রস্তাবিত অন্যান্য টিআরএম সমূহ বাতিল করে দেওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে।।

এখানে বলা দরকার দীর্ঘদিন ধরে একটি কায়েমি স্বার্থবাদী ব্যবসায়ী চক্র টিঅরএমের বিরোধিতা করে ফি বছর নদী কেটে নদীর নাব্যতা রক্ষার নামে গণবিরোধি ষড়যন্ত্রে সফল হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত আছেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সংসদ সদস্যরা। নদী মরুক বা বাঁচুক, জনপদ থাক বা উজাড় হয়ে যাক, তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। বর্তমান

যাচাই বাছাই কমিটির এই সিদ্ধান্ত মহলবিশেষের আকাংখারই নামান্তর। এবং 'বড় প্রকল্প গ্রহণ'-এর প্রস্তাবের সাথে 'বড় ধরনের ব্যবসায়িক স্বার্থ' লুকায়িত আছে। গত তিন বছর ভবদহ গেটের দুইপাশে নদী কেটে সাময়িক ভাবে পানি সরানো গেলেও নদীর নাব্যতা দূরে থাক, মোহনা পর্যন্ত ৬০/৭০ কিলোমিটার নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে। গত ২১ জুলাই, ২০১৮ তারিখ ভবদহ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সরেজমিনে নদী পর্যবেক্ষণ শেষে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, কপালিয়া ব্রিজের পাশে নদীতে পানির গভীরতা ৭ হাত, খুক্শিয়া টিআরএমের সংযোগ-খালের মুখে ৮ হাত, শোলমারি ব্রিজের নিচে ৬ হাত, আরও ভাটিতে গ্যাংরাইল ব্রিজের নিচে ৮ হাত এবং বারো আড়িয়ায় চারমোহনায় দেখা গেছে গ্যাংরাইলে পানির গভীরতা আছে মাত্র ২০ হাত।

বারো আড়িয়ায় স্থানীয় অধিবাসীরা আরও তাঁদের জানিয়েছেন, গত বছর চার নদীর ঐ সংযোগ মুখে গ্যাংরাইলের গভীরতা ছিল ১০০ হাত, আর সেখানে এ বছর মাত্র ২০ হাত।

নদীর নাব্যতা রক্ষা, ভূমিগঠন প্রক্রিয়া, জলাবদ্ধতা নিরসনের প্রশ্ন আর জলাভূমি রক্ষার বিষয় এক নয়। ডেল্টাপ্লান ২১০০ ভিশনে জলাভূমি রক্ষার যে কথা বলা হয়েছে, তার আলোকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধ এলাকাগুলিকে প্রাকৃতিক জলাভূমি দেখানো চরম দৃষ্টিভঙ্গিগত বিভ্রান্তি। জরুরি ভাবে যেটা প্রয়োজন তা হলো, এক, উজানের পানি নিশ্চিত করার জন্য আন্তঃদেশীয় পানির হিস্সা নিশ্চিতকরণ; দুই, বৃষ্টির পানি সকল নদীখাতে প্রবাহের জন্য নদী খালের পূর্বেকার পরস্পর সংযোগ পুনর্জাগরণে, নদীর উজানে জলাধার নির্মাণ; তিন, পলি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদীর নাব্যতা ও ভূমিগঠন প্রক্রিয়াকে বাধামুক্ত করা।

ভেড়ি বাঁধ বুদ্ধিমানের কাজ নয়

১৯২৩ সালে উত্তর বাংলায় বন্যার পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অধ্যাপক ড. প্রশান্ত মহালনবীশকে দায়িত্ব দিয়েছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় অনুসন্ধানের। পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার পর ১৯২৮ সালে তিনি যে রিপোর্ট দেন তাতে বলা হয়েছে বন্যার পানি যাতে দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারে তার জন্য বাধা অপসারণ করতে হবে। নদীর তীর বরাবর সমান্তরাল বাঁধ দিয়ে বন্যা ঠেকানোর পরিকল্পনা কোনও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এতে ভবিষ্যতে বন্যা দীর্ঘস্থায়ী রূপ নেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ প্লাবন-ভূমিতে পলি ওঠা বন্ধ

হয়ে গেলে ভূমি উঁচু হওয়ার কাজই থেমে যাবে; উল্টা, পলি জমে নদীখাত উঁচু হয়ে উঠবে। তখন আবার বাঁধ উপচিয়ে সমতলে পানি ঢুকবে। সে পানি সহজে নিষ্কাশিত হবে না। বন্যা নিয়ন্ত্রণের বদলে বন্যা প্রতিরোধের সব কর্মকাণ্ড শেষ পর্যন্ত মহালনবীশের কথা ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। ষাটের দশকে বন্যানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সম্পর্কে মার্কিন বিশেষজ্ঞ জেনারেল হার্ডিন (Hardin)এবং ওলন্দাজ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর থিস *(Thijse)* যে অভিমত দেন তাও মহালনবীশ রিপোর্টের সাথে মিলে যায়। সর্বশেষ, প্রফেসর পিটার রোজার্স বাঁধপদ্ধতির বিরোধিতা করেছেন। তিনি সোজা সাপটা বলে দিয়েছেন বাংলাদেশের জন্য বন্যা উপকারী। তাই তিনি বন্যা মেনে নেওয়ার পক্ষেই মত দিয়েছেন।

ডাকাতিয়া থেকে জেঠুয়া

খুলনার জেলার ডাকাতিয়ার জনপদ দীর্ঘদিন জলাবদ্ধ ছিল। জনগণ ওয়াপদার বাঁধ কেটে জোয়ারের পানি তুলে বিল পলিভরাট করে নেন। এতেই তাদের জলাবদ্ধতার অবসান হয়। এরপর জনগণ ভরতভায়নার বিল ও ডহুরির বাঁধ কেটে একই কায়দায় জোয়ারে পলি তুলে নিজেদের নিচু বিল উঁচু করে নিয়েছিলেন। এতেই সেখানকার জলাবদ্ধতার নিরসন হয়েছিল। এতে কোনও অর্থ খরচ করা লাগেনি।

২০০৭ সালের কথা। সাতক্ষীরার তালা উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নের কৃষকেরা কপোতাক্ষ নদের ভেড়ি বাঁধ কেটে দিয়ে জোয়ারের পানি ঢুকিয়ে নিয়ে জেঠুয়ার বিল পলি ভরাট করে নিয়েছিলেন। কৃষকরা কেটে দিয়েছিলেন বাঁধের ৬ ফুট জায়গা। পরে আইলায় বাঁধ ভেঙ্গে প্রবেশমুখ ৩০ ফুট ফাঁক হয়ে যায়। বাঁধ কাটার দায়ে কৃষকদের বিরুদ্ধে মামলা হয়। তখন দেশে জরুরি অবস্থা জারি ছিল। পুলিশি চাপের মুখে বাঁধ মেরামতের শত চেষ্টা করেও জোয়ারের তোড় ঠেকানো যায়নি। মাত্র আড়াই মাসে দেখা গেল, জেঠুয়া বিলের তলি পলি ভরাট হয়ে ৬/৭ ফুট উঁচু হয়ে গেছে। গ্রামের চারিধারে রাস্তা থাকার কারণে গ্রামে জোয়ারের পানি ঢুকতে পারে নি। শেষমেশ গ্রামের চেয়ে বিল উঁচু হয়ে গেছে। এর আগের দশ বারো বছর জলাবদ্ধছিল ঐ বিল। চাষাবাদ করা যেত না। এই ঘটনার পর প্রতিদিন বহু লোক জেঠুয়ার বিল দেখতে ভিড় জমাতেন। স্থানীয় জনগণের দাবি ছিল, শতবছরেও আর তাদের বিল ডুববে না। পাখিমারা বিলের পাশাপাশি এই জেঠুয়া বিলেও পানি উন্নয়ন বোর্ডের টিআরএম করার প্রস্তাব পাশ হয়েছিল।

ভাগ্যিশ্ তা আর করা লাগেনি! সরকারও টাকা খরচের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। এখানে কৃষকের অভিজ্ঞতা আর প্রকৃতির অমোঘ শক্তি কাজে লেগেছিল। জোয়ারে উঠে আসা পলিতে দ্রুত বিল পলিভরাট হয়েছিল। জোয়ারের ভরবেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় নদীর তলদেশে জমে থাকা মণ্ডপলি সাগরে নেমে গিয়েছিল। তাতেই সাময়িক ভাবে নদীর মোহনা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। গভীরতাও বেড়েছিল। এ সব অভিজ্ঞতা থেকে নদী কর্তৃপক্ষ যদি শিক্ষা নিতে পারতেন তা হলে দেশের কিছু উপকার হতো। কৃষকদেরও বার বার ভিটে ছাড়া হতে হতো না।

কর্ডন পদ্ধতির ক্ষতির দিক

১. কর্ডন এলাকার আয়তন বাড়ার সাথে পানির প্রাকৃতিক প্রবাহক্ষেত্র সংকুচিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে প্লাবনতলের উচ্চতা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে থাকে।

২. মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র সংকুচিত হয় ও উৎপাদন হ্রাস পায়।

৩. প্লাবনসমতলে পলি উঠতে না পারায় জমির উর্বরতা হ্রাস পায়।

৪. পাতাল জলের ভাণ্ডার পুনর্ভরণে বিঘ্ন ঘটে।

৫. মোহনা অংশে পলিভরাট হয়ে নদী নাব্যতা হারায়, বিল থেকে নদীখাত উঁচু হয়ে উঠে এবং স্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। আরও অনেক ধরনের ক্ষতির কথা বলা যায়।

মুক্ত প্লাবনের সুবিধা

১. পলি জমে অবনমন পূরণ হয়ে ভূমির উচ্চতা বাড়বে।

২. জমি উর্বর হবে। প্লাবন শেষে বিনা চাষে পলিযুক্ত মাটিতে ছিটে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে ডাল, সরিষা ও রাই জাতীয় ফসল ফলানো সম্ভব হবে; চাষের খরচ ও শ্রম দুইই সাশ্রয় হবে।

৩. প্রতিবছর মুক্ত বন্যায় ভূ-নিম্নস্থ পানির ভান্ডার (aquifer) পূর্ণ হয়ে উঠবে।

৪. ভূমির অম্লতা কমে আসবে। মাটি ও পানি আর্সেনিক মুক্ত থাকবে।

৫. পরিবেশের আর্দ্রতা বাড়বে। উষ্ণতা হ্রাস পাবে।

৬. গাছপালা পুষ্ট ও সবুজ হয়ে উঠবে।

৭. বন্যায় পরিবেশ নির্মল হবে; মশার উপদ্রব কমবে; জনস্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে।

৮. সমতলে পলি উঠায় নদীতে অতিরিক্ত পলি জমে না, তাতে নদীখাত গভীর থাকবে।

৯. নদীর গভীরতা বাড়লে পাড় ভাঙ্গন কমে আসবে।

১০. উজানের মিঠে পানির প্রবাহে লবণাক্ততা দূরীভূত হবে।

১১. নৌপথের উন্নতি ঘটবে; জ্বালানি খরচ কম হবে ও বায়ু দুষণ হ্রাস পাবে।

১২. কৃষিপণ্য পরিবহনে খরচ কমবে।

১৩. সর্বোপরি উন্মুক্ত নীতির পাশাপাশি নদী ও খালের নেটওয়ার্ক পুনরুজ্জীবিত করে এক এলাকার বাড়তি পানি ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা যায়। তার ফলে পাড় উপচানো উচ্চ প্লাবনের বিপদ কমে; এটাই বন্যা নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ উপায় হতে পারে।

১৪. সেই সাথে অববাহিকার বিল, বাওড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক জলাশয় ও ছোট বড় পুকুরগুলি জলাধার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিশেষ করণীয়

১. সমস্যাগুলি স্থানীয় ব্যাপার হিসেবে দেখা দিলেও তা জাতীয় সমস্যারই অংশ। আবার দেখা যায়, তা একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; আঞ্চলিক উদ্যোগ ছাড়া তার সমাধান সম্ভব নয়। বাংলাদেশের নদীসমস্যার অনেকগুলো ভারত, নেপাল, ভূটান ও চীনের সাথে যুক্ত। এক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক, ত্রি-পাক্ষিক উদ্যোগ গ্রহণই সমাধানের পথ। বিশেষ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য নিতে হবে।

২. গ্রীষ্মকালে নদীপ্রবাহ ঠিক রাখার প্রয়োজনে উজানে পার্বত্য এলাকায় পানি সংরক্ষণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মতি আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ সঙ্গত।

৩. নৌপথের নেটওয়ার্ক সৃষ্টির জন্য আঞ্চলিক দেশগুলির সাথে মিলে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

আশু করণীয় ও সুপারিশ

১. জলবায়ু পরিবর্তন-এর অভিঘাত থেকে জনপদ রক্ষা ও বন্যা, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. বন্যার তীব্রতা প্রশমিত করতে সহনশীল মাত্রায় বন্যা মেনে নেওয়া;

৩. প্রাকৃতিক প্রবাহগুলির পুনরুদ্ধার, সচল ও উন্নয়ন সাধন করা ;

৪. জীবিত নদীগুলো খনন করে তাদের পানি ধারণ ক্ষমতা ও প্রবাহ বড়ানো ;

৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণে মজানদী ও খাল খনন সহ নদনদীর আন্তঃসংযোগ গড়ে তোলা যাতে এক এলাকায় পানি বাড়লে ভিন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দেওয়া যায় ;

৬. বর্ষাকালে বিস্তীর্ণ সমতলে বন্যার পানি প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে প্লাবন তলের উচ্চতা বিপদসীমা অতিক্রম করতে না পারে;

৭. কর্ডন ব্যবস্থার অবসন ঘটিয়ে মুক্ত প্লাবন নীতি কার্যকর করা; বসত ভিটা, গঞ্জ ও বাজার-এর ভিটা উঁচুকরণ ও নির্দিষ্ট শহর, বাজার, গঞ্জ ও জনপদ রক্ষায় সীমিত আকারে কর্ডন মেনে চলা;

৮. মাথাভাঙ্গা-পদ্মার সাথে পুনঃ সংযোগ সহ ভৈরব নদীকাঠামো জাগ্রত করে কপোতাক্ষ সহ সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে সমুদ্রগামী সকল নদীতে মিঠা পানির প্রবাহ নিশ্চিত করা;

৯. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পূর্ব সীমানা মধুমতি নদীর উৎস মুখ খনন করে পদ্মার সাথে সংযোগ পুনস্থাপন;

১০. উজানে নদী সংযোগ স্থাপনের আগ পর্যন্ত জোয়ারের ভরবেগ বৃদ্ধি করে মোহনা মুক্ত ও জলাবদ্ধতা নিরসনে টিআরএম ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা; দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পর্যায়ক্রমে বাঁধ কেটে কর্ডনগুলি নিঃখরচায় পলিভরাট করা এবং পলিভরাট সময়কালে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে বিনামূল্যে খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি জীবনোপকরণের খরচ দেওয়া;

১১. সমতলে বন্যার প্রবাহ বাধামুক্ত করতে রেল ও সড়কের ব্রিজগুলির প্রশস্তকরণ, নদী ও ভূমিঢালে পানি প্রবাহ বাধা মুক্ত করা ;

১২. শুকা ও বর্ষা মৌসুমের সাথে সঙ্গতি রেখে ধান ও অপরাপর ফসলের জাত নির্বাচন ও গবেষণার মাধ্যমে গভীর পানিতে টিকে থাকতে সক্ষম এমন দীর্ঘকাণ্ড ধানের উন্নয়ন ঘটানো;

১৩. মাছের বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্রগুলি অবাধ করার স্বার্থে নদী ও খালের মুখে জলকপাট অপসারণ;

১৪. মৎস্য সম্পদ ও শুকা মৌসুমে সেচ সুবিধার্থে হাজামজা পুকুর, খাল, বিল, বাওড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক জলাধার সংস্কার করে গভীরতা বাড়ানো যাতে বেশি বেশি বর্ষার পানি জমিয়ে রাখা যায়।

উপসংহার

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। ওয়াপদা ভেঙ্গে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে। কিন্তু আজ অবদি পানি নীতি প্রণয়নে ক্রুগ মিশন-এর সুপারিশের বাইরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পানি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়া যায়নি। বিদেশি প্রভাব বলয়ের জাল ছিন্ন করে স্বাধীন দেশে স্বাধীন পানি নীতি গ্রহণ সম্ভব হয়নি। ফ্যাপ বাস্তবায়ন কাল পর্যন্ত পুনর্বাসন তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছিল। সে পুনর্বাসন মানে ক্রুগ মিশন প্রস্তাবের পুনর্বাসন। ডেল্টা প্লান ২১০০-এর কৃতিত্ব হলো এখানে পুনর্বাসনের নাম উচ্চারণ করা হয়নি। তবে সুকৌশলে পুনর্বাসন নীতি চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। যুক্তি তর্ক আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে এ যেন সেই নতুন বোতলে পুরাতন মদ পরিবেশরন কায়দা। ডেল্টা প্লান ২১০০ বাস্তবায়িত হলে যে ক্ষতি হবে আগামী শত বছরেও তা পূরণ হবে না। তাই তড়িঘড়ি করে ডেল্টা প্লান বাস্তবায়ন থেকে বরং বিরত হওয়া সমীচীন। তার আগে আমরা দেশি ও প্রকৃত দেশপ্রেমিক বিশেষজ্ঞদের মতামত পরামর্শ

গ্রহণ করা সঠিক বলে মনে করি। আমাদের দেশে বহু মানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ আছেন। তাঁদের আমরা এ কাজে ডাকতে পারি।

ভূ-প্রকৃতির তাৎপর্য বিচারে বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অংশ। এখানে নদী থেকে প্লাবন ভূমিকে বিচ্ছিন্ন করার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প মাতৃ নাড়ি থেকে গর্ভস্থ শিশুকে বিচ্ছিন্ন করার সামিল। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের মৌলিক চরিত্রকে উপেক্ষা করে এখানে কোনও ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল কাজে আসবে না। তা কেবল বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। তাই, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই পরিকল্পনা নিতে হবে। ডেল্টা প্লান ২১০০ প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন সুন্দরবন সহ সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলকে আরও সুদূরপ্রসারি বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেবে। ক্রুগ মিশন, আইইসিও, এনডব্লিউপি, ফ্যাপ ইত্যাদি বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর প্রকল্প জনপদ, ভূ-প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের জন্য দারুন বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে। বর্তমান ডেল্টা প্লান ২১০০ অতীত পানি নীতির নয়া সংস্করণ। প্রকৃতি জনপদ ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী।

তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো, কর্ডন পদ্ধতি নয়, উন্মুক্ত পদ্ধতি পানি নদী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষায় সুদূরপ্রসারি ফলাফল বয়ে আনতে পারে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজন ক) উজানের পানি নিশ্চিত করার জন্য আন্তঃদেশীয় পানির হিস্সা নিশ্চিতকরণ; খ) বৃষ্টির পানি সকল নদীখাতে প্রবাহের জন্য সকল নদী ও খালের পূর্বেকার পরস্পর সংযোগগুলির পুনঃস্থাপন এবং নদীর উজানে জলাধার নির্মাণ; গ) পলি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নদীর নাব্যতা ও ভূমিগঠন প্রক্রিয়াকে বাধামুক্ত করা সবিশেষ জরুরি। ঘ) সর্বোপরি এই মুহূর্তে কোনও মতেই টিআরএম প্রকল্পগুলি বাতিল করা চলবে না। সেগুলি চালু রাখতে হবে।

আমাদের দেশে প্রকল্প গ্রহণ ও বিদেশি অর্থায়নের সাথে যুক্ত থাকে অসম স্বার্থ। গড়ে ওঠে কায়েমি স্বার্থপুষ্ট দুর্নীতির চক্র। ডেল্টা প্লান ২১০০-এর ক্ষেত্রে এ সকল উপসর্গের হাত থেকে মুক্ত থাকার বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। ডেল্টা প্লান ২১০০ আসলে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাযজ্ঞ। দেশের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। নানাবিধ বিষয় বিবেচনায় ডেল্টা ২১০০ পরিকল্পনা বঙ্গীয় ব-দ্বীপ পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিশেষকরে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সুন্দরবন সহ সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য মহাবিপর্যয় ডেকে আনবে। সেই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে যেন আরও অনেক সংগ্রাম আন্দোলনের পথে যেতে না হয় তার জন্য আগে থেকে

সতর্ক হতে হবে। পুনরায় ভুলের খেসারত দিতে হলে অনেক পুরুষ কেটে যাবে। হয়তো বা আরও শত বৎসর সময় লাগবে। তাই কোনও ধরনের অস্থিরতা বা স্বতঃস্ফূর্ততা বা বিদেশি অর্থায়ন সুবিধার কথা বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে তড়িঘড়ি করা ঠিক হবে না। সকলের প্রতি, দেশের জনগণের অভিজ্ঞতা ও দেশীয় বিশেষজ্ঞদের সংশ্লিষ্ট করে অতীত প্রকল্পগলির ব্যর্থতা সফলতার পর্যালোচনা ও তার সুদূরপ্রসারি ফলাফল বিবেচনায় নেবার অনুরোধ রাখি।

"গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা

আমার দুই চোখে দুই জলের ধারা মেঘনা যমুনা।"

যুগ যুগ ধরে এই ধরনের মরমি সুরের অনুরণনে বাঙালি হৃদয় সিক্ত হয়েছে। আরই সাথে মূর্ত হয়ে উঠেছে এক মরমী দর্শন। নদী ও মানব প্রকৃতির সম্পর্কের দর্শন। নদীকে বাংলার মানুষ মা ডাকে। প্রতিটি বাঙালি নদীকে ভালবাসে। শ্রদ্ধা করে। নদীর পলিতে বাংলা মায়ের জন্ম একথা বাঙালি ব্যতিরেকে আর কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। বিদেশি বিশেষজ্ঞরা নদীকে মানব প্রকৃতির প্রতিপক্ষ ভাবতে পারেন! তাদের দৃষ্টিতে নদী ও বন্যা জনপদের জন্য কেবল ধ্বংসই ডেকে আনে! বিদেশিদের দৃষ্টিতে তাই বাঙালির নদী-সম্পর্কিত দর্শনেরই পরিবর্তন ঘটে গেছে! হয়তো বা সে কারণে নদীর পায়ে বেড়ি পরাতেই তাদের এত সব পরামর্শ! বিপরীতে বাংলার মানুষ চায় নদী ও মানব প্রকৃতির সম্পর্কের পুনঃস্থাপন। তারা চায় নদীকে বেড়িমুক্ত করতে। নদী বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে। নদী বাঁচানোর স্বার্থে বাংলাদেশকে ফিরে যেতে হবে মুক্ত প্লাবনে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তার জন্য খুলে দিতে হবে উজানে মাথাঙ্গার সাথে ভৈরবের উৎস মুখ। মোহনাই নদীর ভিত্তি। সেই মোহনা মুক্ত করার জন্য এলাকার কৃষক জনপদের চিরায়ত অভিজ্ঞতার আলোকে আবিষ্কৃত হয়েছে টিআরএম বা জোয়ারাধার পদ্ধতি। সেই অভিজ্ঞতার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে ভবদহ কপোতাক্ষ অববাহিকায়। মোহনা মুক্ত হওয়ার সাথে সমন্বয় করে উজানের উৎস মুখ উন্মুক্ত করার কাজ সম্পন্ন হলে পুনরায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী ও প্রকৃতির সাথে জনপদ ও জনগণ ফিরে পাবে তাদের স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ।

ঋণ স্বীকার :

1. Professor Dr. Nazrul Islam : Alternative Approaches to Flood Control : The Case of Bangladesh
2. কপিল ভট্টাচার্য ঃ বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা
3. Professor Dr. Md. Khalequzzaman, Assistant Professor, Department of Geology & Physics, Georgia South Western State;. University Americus, USA : Flood Control in Bangladesh through Best Management Practices
4. আশরাফ-উল-আলম টুটু : উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প জলাবদ্ধতার সূচনা (১৯৯৭);
5. Peter Rogers : Eastern Waters Study-1989
6. Ramesh Chandra Mazumdar : The Economic History of India
7. প্রতাপ চন্দ্র : বাংলাদেশ ডুবছে না, ইত্তেফক ১০ ফেব্রুয়ারি, ১০১০
8. History of Indian Railway : Google
9. CEGIS.